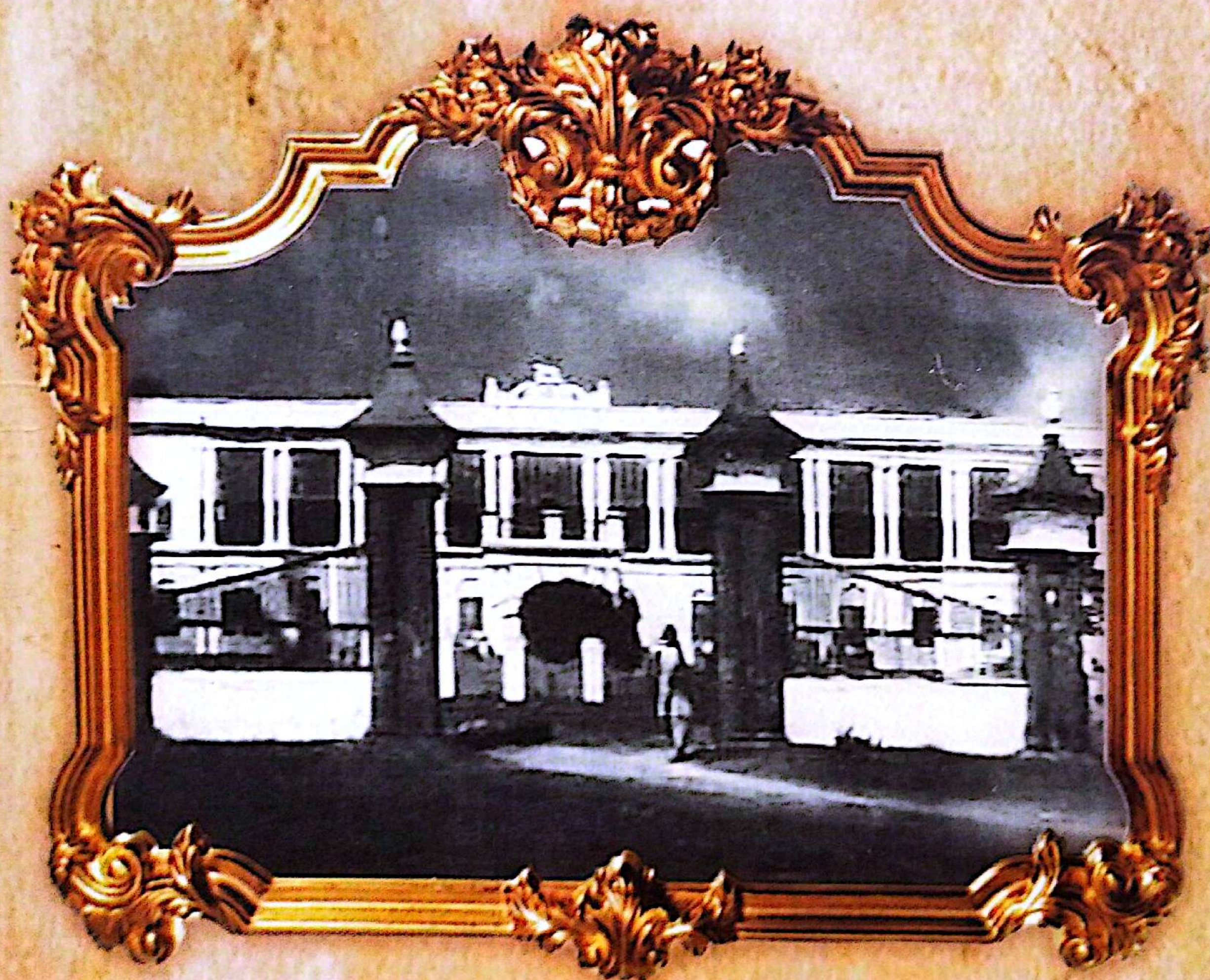
বারুইপুর ও রায়চৌধুরী পরিবার



শক্তি রায়চৌধুরী

বারুইপুর ও রায়চৌধুরী পরিবার

শক্তি রায়চৌধুরী



শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠ

রামনগর-উত্তরভাগ, বারুইপুর

বারুইপুর ও রায়চৌধুরী পরিবার
Baruipur & Roychowdhury Paribar

প্রকাশিকা ঃ
সন্ন্যাসিনী তপোময়ী পুরী
শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠ
1, ইব্রাহিমপুর রোড, কলকাতা-700032
ফোন ঃ 2412-0769, 9331017262, 9874715659

প্রথম প্রকাশ ঃ সত্যানন্দ মেলা জানুয়ারী, ২০১৫

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ©

অক্ষরবিন্যাস এবং মুদ্রণে
সিটি গ্রাফিক্স
18এ, ডাঃ ধীরেন সেন সরণী
কলকাতা-700006
ফোন ঃ 9330981277

প্রণামী ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র (Rs. 50/-)

প্রকাশিকার নিবেদন

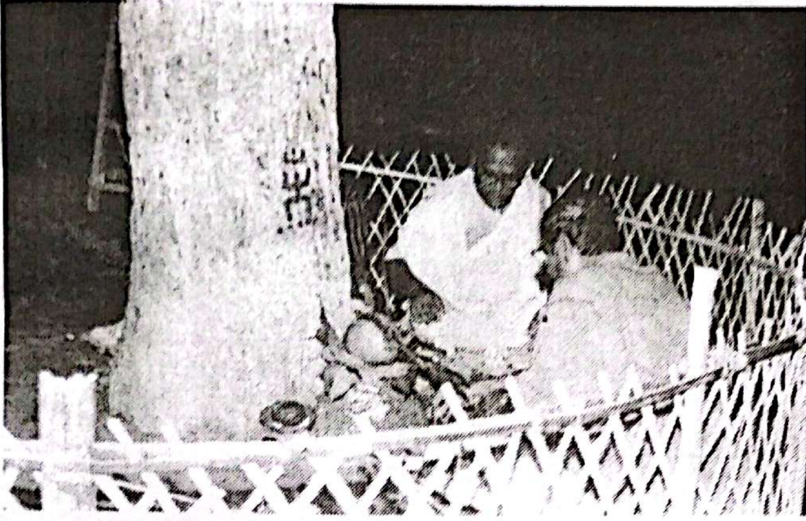
বারুইপুরের বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবার এতদঞ্চলের একটি নামী বংশ। বারুইপুর অঞ্চলে তাঁদের নানা কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে রয়েছে। ঘুটিয়ারী শরীফের বিখ্যাত গাজীপীরের সঙ্গে তাঁদের একটি যোগসূত্র ছিল। জমিদারীর দৌলতে গোটা পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের নাম অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গে একই ভাবে উচ্চারিত হ'ত। এই পুস্তিকায় সেই বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের একই বংশধর—বারুইপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্রীশক্তি রায়চৌধুরী মহাশয়।

শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সত্যানন্দ মেলায় এই পুস্তকটি প্রকাশিত হচ্ছে সাধারণের মধ্যে এই ইতিহাস প্রচারের নিমিত্ত। কারণ, জমিদারী প্রথা অবলুপ্ত হ'লেও তার ঐতিহ্য জানার আগ্রহ মানুষের মধ্যে থাকেই। এই বারুইপুর অঞ্চলেই আজ গড়ে উঠেছে এক বিরাট লোককল্যাণকর প্রকল্প শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠ। এই মহাপীঠের কর্মকাণ্ডেরও রায়চৌধুরী পরিবারের আন্তরিক সহযোগিতা উল্লেখনীয়।

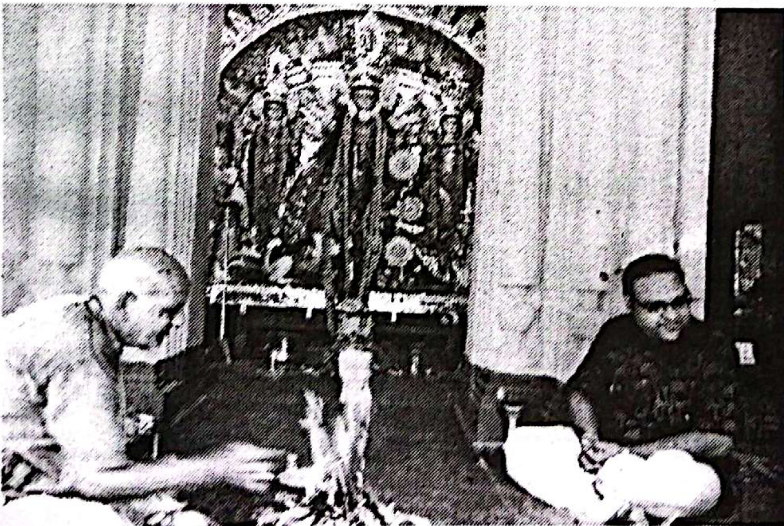
এই পুস্তিকা পাঠকবর্গকে সন্তৃপ্ত করবে এই আমাদের আশা। সকলের কুশল মঙ্গল প্রার্থনা করি। ইতি

শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠ
রামনগর-উত্তরভাগ, বারুইপুর।
১৮ জানুয়ারী, ২০১৫

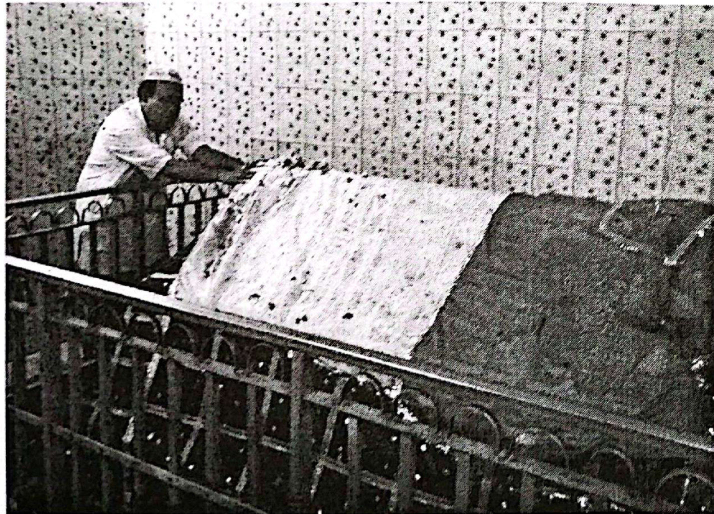
সন্ন্যাসিনী তপোময়ী পুরী
সম্পাদিকা

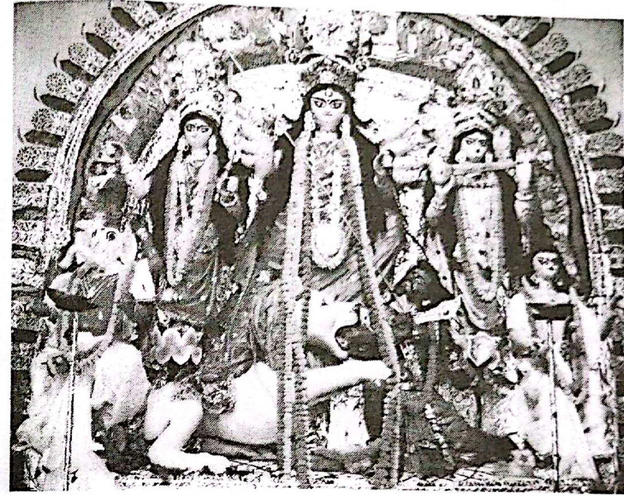




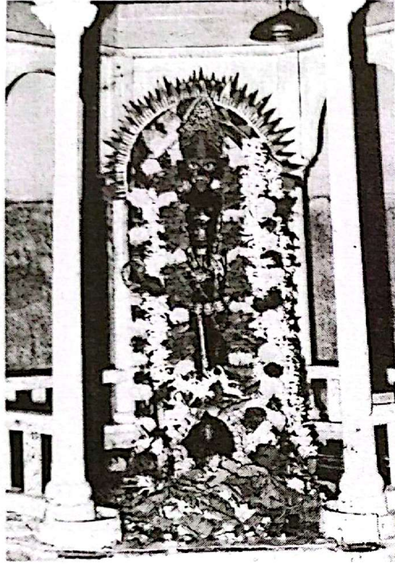


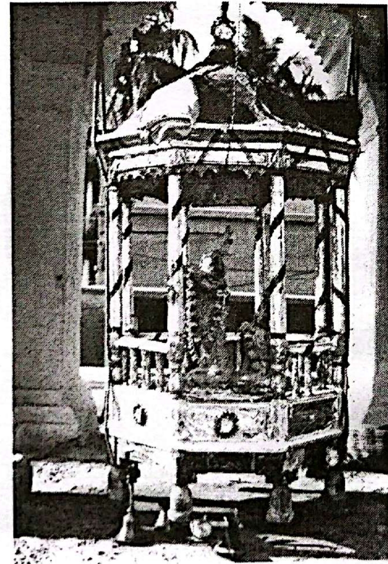






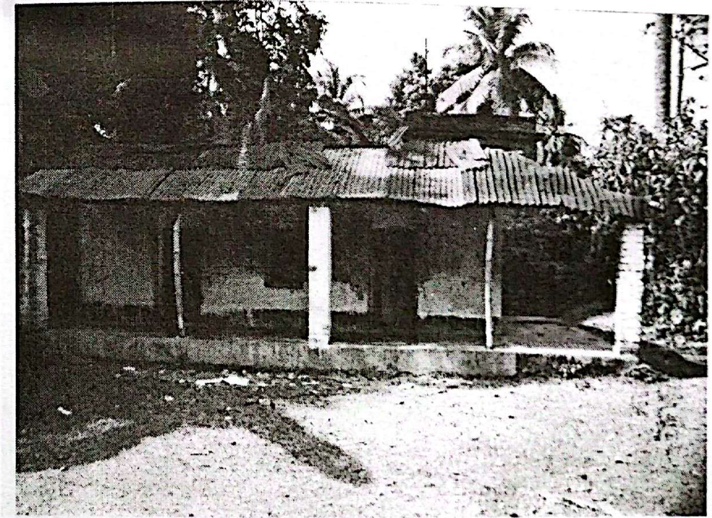




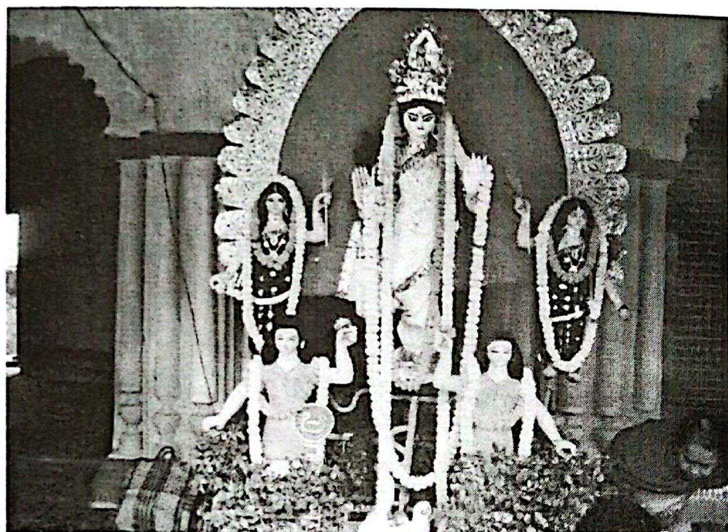


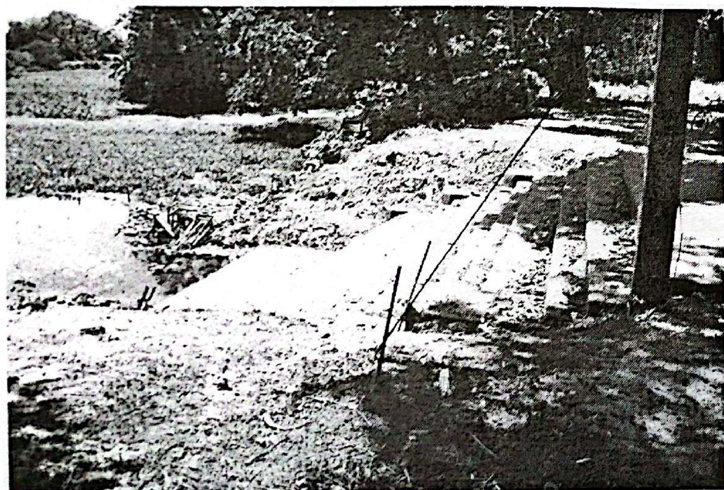
(J)



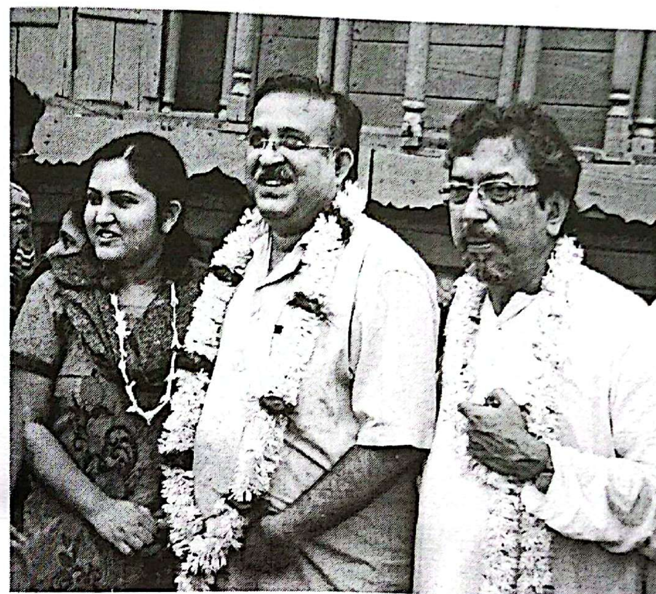


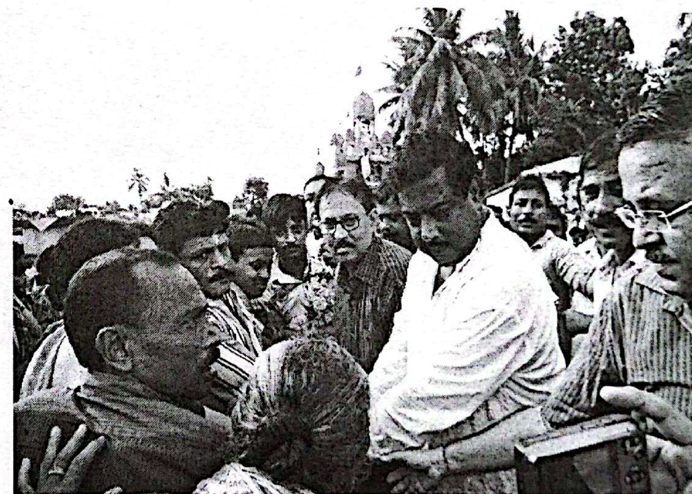
(K)



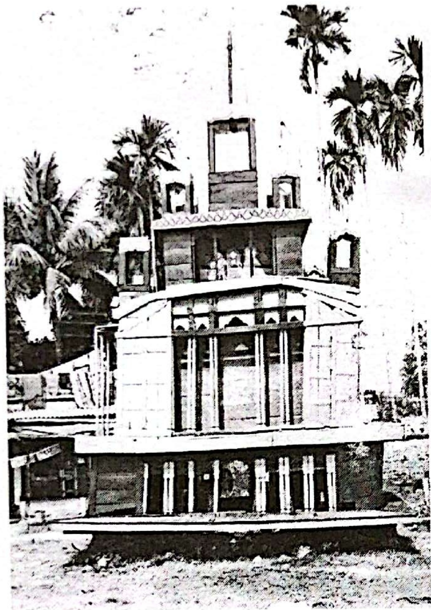


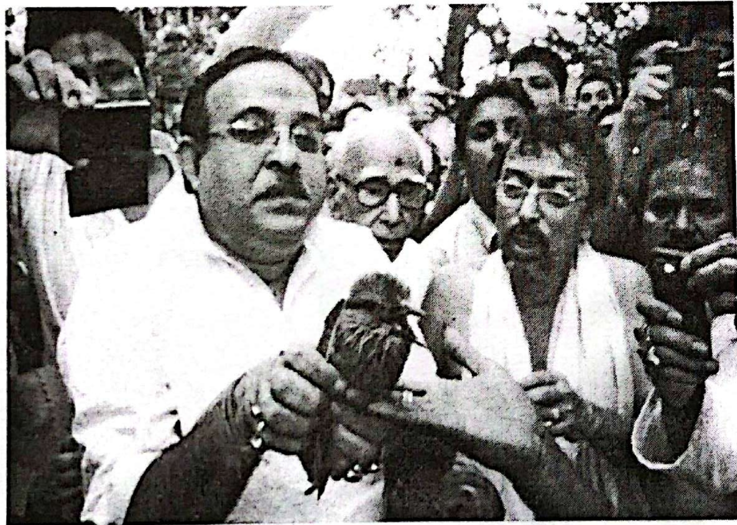
(N)



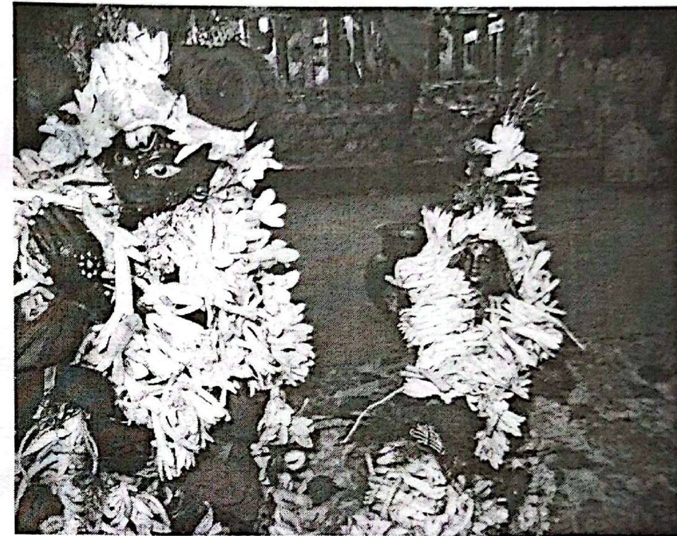


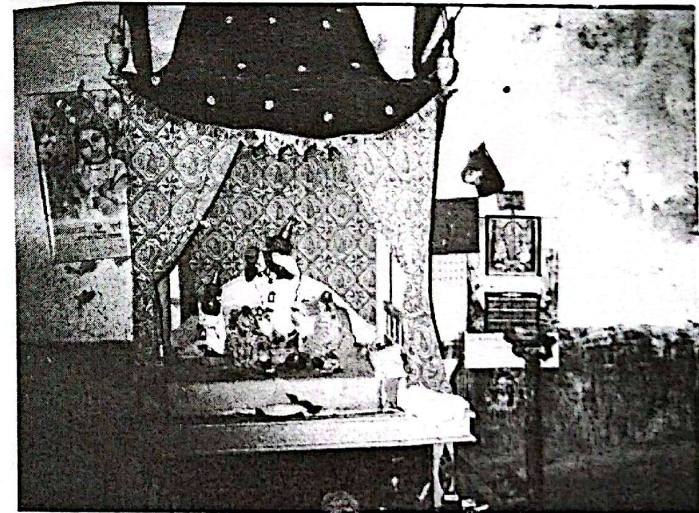
(O)



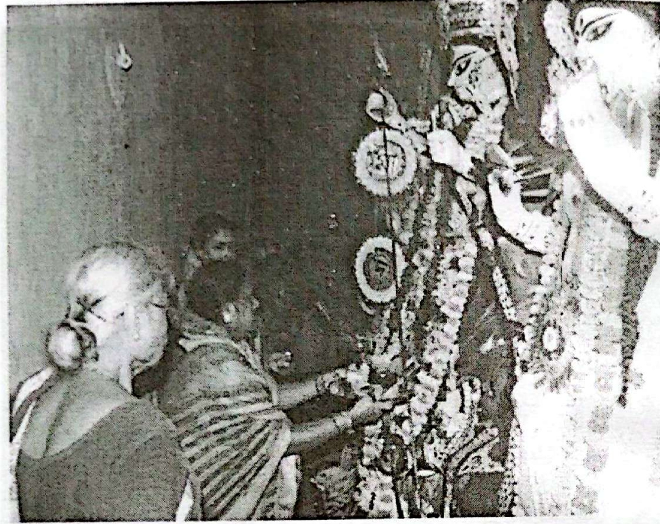


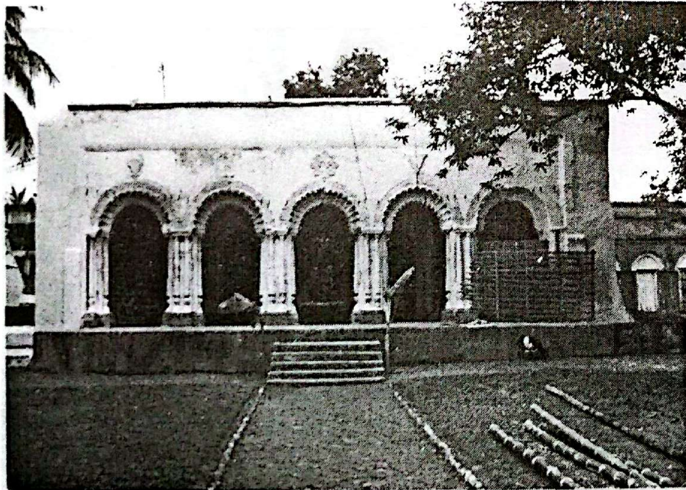
(P)



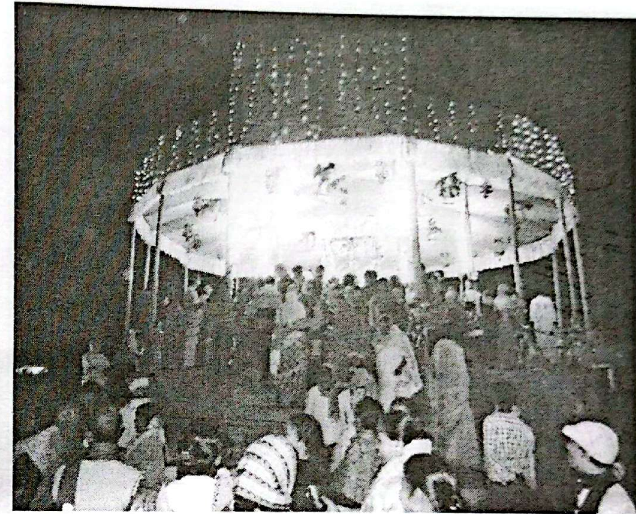


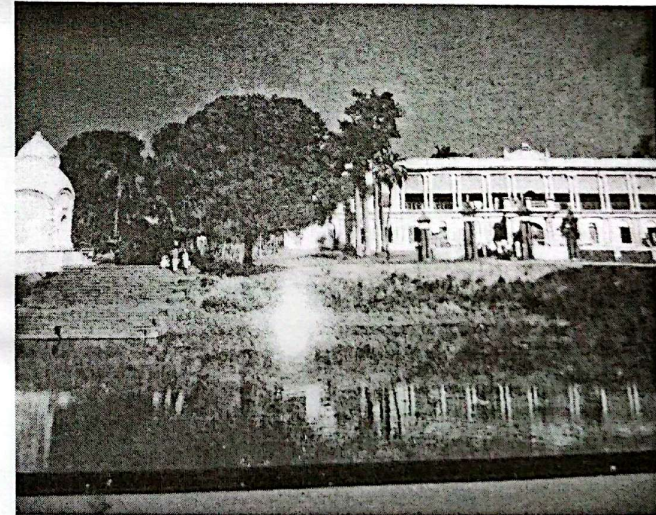
(Q)



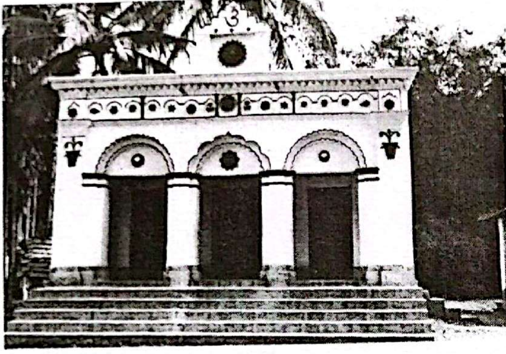


(R)

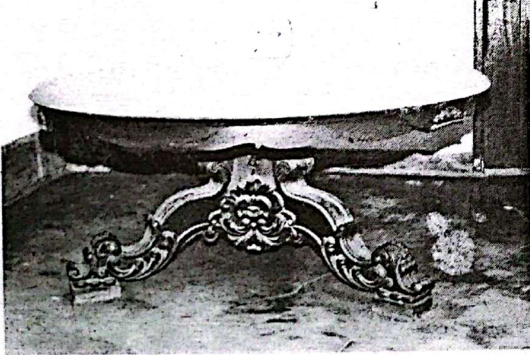




(S)







বারুইপুর ও রায়চৌধুরী পরিবার

নীল সমুদ্র তরঙ্গরাশি অপসারিত করে সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বঙ্গমাতা যখন উত্থিত হলেন, তখন তিনি যেখানে আপনার শ্রী পাদপদ্ম স্থাপন করেছিলেন, তাই আমাদের ২৪ পরগণা। এখানেই তাঁর বাহন সুচিত্রিত রাজব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে পদন্যাস করে যা আমাদের সুবর্ণ কিরীট কাঞ্চনশৃঙ্গে ভূষিতা হয়ে বিশ্বের সমক্ষে প্রকাশিত হয়েছিলেন, যে স্থান তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শে ধন্য। আমরা তার আদিবাসী বলে নিজদিকে ধন্য মনে করছি। আমরাই যে বঙ্গমাতার চরণ সেবার অধিকারী, আমাদের বাসভূমি তাই বলে দিচ্ছে, আমিই আমাদের সেই জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সি মায়ের শ্রীচরণে শ্রদ্ধা ও ভক্তির কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করি। দক্ষিনাংশের মধ্যে সামান্যতম অংশ - বারুইপুর। আর সেই বারুইপুরের ঐতিহ্যশালী জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের কিছু কথা নিবেদন করছি।

জমিদার কারা

জমিদার কাকে বলে? জমিদারি কি? মোঘল আমলে জমিদারি সংস্থাকে রাজস্ব ব্যবস্থার মৌল ভিত্তি বলা যায়। বস্তুত জমি ও তাহার ফল ভোগাধিকার উচ্চতম যে সব বিভিন্ন স্বার্থ জড়িত ছিল এই সংস্থাই তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিত। সাধারণত জমিদার নিজে জমির চাষবাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু উৎপন্ন ফসলের একাংশের উপর তাহার দাবি ছিল, জমিদার বলতে বুঝাইত সেই ব্যক্তিকে যাহার জমিতে অধিকার ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারের স্বত্ব ও দাবির ধরন ছিল বিভিন্ন। এমনকি, একই অঞ্চলে বা প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের জমিদারির নিদর্শনও পাওয়া যায়। মোটামুটি ভাবে এইসব স্বত্ব ও দাবিগুলি একটি স্থায়ী ভিত্তিতে গঠিত ছিল এবং বংশানুক্রমে তাহা ভোগ করা হইত। এইসব স্বত্বগুলির অধিকাংশই উদ্ভুত হইয়াছিল বসবাসে প্রথম যুগে অথবা ঐ অঞ্চলগুলি অধিকৃত হইবার সময়। এবং কয়েকটি স্বত্ব পরবর্ত্তী যুগে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত হইয়াছিল, আবার কোন কোন সময়ে মোঘল সরকার নিজেও বিভিন্ন ধরনের জমিদারি স্বত্ব দান করিয়াছিল। যদিও উপরিউক্ত জমিদার শ্রেণীর

মধ্যে বিভিন্ন স্তরভেদ ছিল তবুও শ্রেণীগতভাবে ইহারা আসামি বা রায়ত নামে পরিচিত কৃষক শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন এবং কৃষক শ্রেণীর তুলনায় ইহাদের পদমর্যাদা অনেক উচ্চ ছিল। এই দিক হইতে বলা যায় যে, 'জমিদারি' শব্দটির যথেষ্ট অসংযতভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সব ব্যক্তিকে জমিদার বলা হইত যাহাঁরা বিভিন্ন শর্তে জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিতেন। জমিদারি প্রথা যে কেবলমাত্র বিভিন্ন শর্ত বা চুক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল, তাহাই নহে, উপরন্ত বিভিন্ন জমিদারির সীমাও বিভিন্ন অঙ্কের ছিল।

যে সকল জমিদার মোঘল সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করিতেন তাঁহাদেরও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়। প্রথমে উল্লেখ করা যায় সেই সব জমিদার বা রাজন্যবর্গের, যাঁহারা মোঘল সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করতেন। কিন্তু যাহাদিগকে সামরিক অথবা অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত তাঁহাদের জমিদারির মধ্যে মোঘল সম্রাটের মুদ্রার প্রচলনে ঐ স্বীকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর জমিদাররা সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নির্দিষ্ট পেশকাশ প্রদানের শর্তে নিজস্ব রাজত্ব ভোগ করিতেন। যে সকল জমিদার সরকারকে পেশকাশ অথবা কর প্রদান করিতেন তাদের মূল দলিল-দস্তাবেজে তাঁহারা পেশকাশ জমিদার বলিয়া গণ্য হইতেন। বঙ্গদেশ সরকারের দলিল পত্রে ১৭৬৯-৭০ সালের বন্দোবস্তের (বিলি ব্যবস্থা) যেসব প্রতিলিপি রহিয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে বিভিন্ন আয়তনের জমিদারের যথা, একাধিক পরগণা, একটি পরগণা, একটি বা একাধিক তালুক লইয়া জমিদারি গঠন।

তিন প্রধান জমিদার

দঃ ২৪ পরগণার তিন প্রধান জমিদার বংশ হল বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরী, বাওয়ালির মণ্ডল ও বারুইপুরের রায়চৌধুরী। এই প্রধান জমিদার বংশের উল্লেখ আছে এলাহাবাদ ডকুমেন্ট (আকবরের রাজত্বকাল ও বাহাদুর শাহ-এর রাজত্বকালে)। ইহাদের মধ্যে বাওয়ালির ও বড়িষার জমিদার বংশের ইতিহাস রচিত হয়েছে। কিন্তু বারুইপুরের জমিদার বংশের ইতিহাস রচিত হয়নি। এমনকি ইংরেজ আমলে পাওয়া লর্ড ক্যানিং, পাইকপাড়ার রানি হর্ষমুখির বংশের ইতিহাসও রচিত হয়েছে। শুধু রচিত হয়নি এমন একটি জমিদার বংশের ইতিহাস যাদের জমির আয়তন দিয়ে পরিমাপ করলে এই বংশ বার ভুঁইয়ার জমিদারের থেকেও কম নয়। যদিও দুটি পরগণার (মদনমল্ল ও পাঁচাকুলি) জমিদার ছিল। কিন্তু ফেড্রিক ইডেন পারগিটার সাহেবের 'সুন্দরবন রেভিনিউ' ইতিহাস নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, উপরোক্ত দুটি পরগণা ছাড়াও রায়মঙ্গলের পশ্চিম ও বিদ্যাধরীর দক্ষিণে বিস্তৃত ভূমির অধিকার ছিল বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবার, পরে তাহা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অথচ বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরী বংশের ইতিহাস প্রকাশ ঘটলেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রকৃত ইতিহাসটা উন্মোচন হতে পারে। বারুইপুরের রায়চৌধুরী বংশের ইতিহাস উন্মোচিত না হলে দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রকৃত ইতিহাস উৎঘাটিত হবে না। এই প্রসঙ্গে জানা দরকার বার ভূঁইয়া কারা? কেন তাদের বার ভূঁইয়া বলা হয়।

বাংলার ভূঁইয়া

১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয়, কিন্তু একদিনে সমগ্র বঙ্গ অধিকৃত হয় নাই, এমনকি পূর্ব্ববঙ্গ শাসনাধীন করতে প্রায় দেড় শতবর্ষ লাগিয়াছিল। ততদিন বঙ্গে রাজত্ব দিল্লীর অধীনে ছিল। সমগ্র বঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসিবার পর, ১৩৪০ সালে কেহ কেহ প্রকাশ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই সময় হইতে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের কাল পর্যন্ত বঙ্গীয় স্বাধীন শাসন যুগ ধরা যাইতে পারে, ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের রাজ্যারম্ভ হইতে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের রাজ্যলাভ পর্যন্ত কোন সু-শাসন ছিল না। সম্রাট আকবর দিল্লির সিংহাসনে বসার পর যারা প্রকাশ্য স্বাধীনতা করেছিলেন, তাদের বিদ্রোহ দমন করেন, সেই সময় যে ১২ (বার) জন বিদ্রোহ করে নিজেদের প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষনা করেছিলেন তাঁরা ১২ (বার) ভূঁইয়া নামে খ্যাত, এই (১২) বার জন ভূঁইয়া হলেন (১) ঈশা খাঁ মসনদ আলি - খিজির পুর (২) প্রতাপাদিত্য - যশোহর (৩) চাঁদ রায় - কেদার রায় - শ্রীপুর বা বিক্রমপুর (৪) কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় - চন্দ্রদ্বীপ (৫) লক্ষ্মণ মাণিক্য - ভুলুয়া (৬) মুকুন্দরাম রায় - ভূষণা বা ফতেহাবাদ (৭) ফজল গাজী - ভাওয়াল ও চাঁদ প্রতাপ (৮) হামীর মল্ল বা বীর হাম্বীর - বিষ্ণুপুর (৯) কংসনারায়ণ -

তাহিরপুর (১০) রামকৃষ্ণ - সাতৈর বা সান্তোল (১১) পীতাম্বর ও নীলাম্বর - পুটিয়া (১২) ঈশা খাঁ লোহানী ও ওসমান খাঁ - উড়িষ্যা বা হিজলী।

কুলিন বা কায়স্থ

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ বা কনৌজ হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রন করে বাংলা এনেছিলেন একটি যজ্ঞানুষ্ঠান করবার জন্য। কারণ একটি পুত্র লাভের আশায়, কেউ কেউ বলেন দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রাজ্যকে রক্ষার নিমিত্তে। সেই সময় বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও যজ্ঞানুষ্ঠানে পারঙ্গম কোন ব্রাহ্মণ তাঁর রাজ্যে নাকি ছিল না, সনাতন হিন্দুধর্মের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে তখন কান্যকুব্জের খুব নাম ডাক ছিল।

এই আমন্ত্রিত পাঁচজন ব্রাহ্মণ নাকি এসেছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে। তাহে ছিল তাঁদের ধনুর্বান। যোদ্ধা বেশী ব্রাহ্মণদের দেখে স্বভাবতই আদিশূরের কেমন সন্দেহ হয় এবং তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা দান করতে বিরত থাকেন। তখন রাজার আচরণে বিরক্ত ও রুষ্ট হয়ে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজা ও রাণীকে আশীর্বাদ করবার জন্য যে সকল ফুল ও ঔষধি সঙ্গে এনেছিলেন সেগুলি ছুঁড়ে দেন একটি বাজপড়া শুস্ক তরুকাঠের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছুঁড়ে দেওয়া ফুল ও ঔষধির স্পর্শে সেই শুস্ক তরু পুষ্পিত ও পল্লবিত হয়ে ওঠে। এই অলৌকিক ঘটনায় মুগ্ধ হয়ে তখন আদিশূর ব্রাহ্মণের কাছে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ ও মার্জনা ভিক্ষা করেন। রাজাকে মার্জনা করেন ব্রাহ্মণেরা ও আয়োজিত যজ্ঞাদি সমাধা করে পুনরায় তারা স্বদেশে কান্যকুব্জে ফিরে যান।

কিন্তু স্বদেশে ফেরার পর তাঁদের অবস্থা হয় শোচনীয়। সে দেশের পণ্ডিতরা বললেন তোমরা বাংলা দেশের মতো একটা অখ্যাত পাণ্ডববর্জিত দেশে গেছ বলে তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব কলুষিত হয়েছে। সুতরাং তোমাদের সমাজে আর ঠাঁই নেই। তখন সেই পাঁচজন সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হয়ে, পাঁচ সহচর সহ বাংলা দেশে ফিরে আসেন। আদিশূর তখন ওই পাঁচজন ব্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ হলেন - কাস্যপগোত্রি দক্ষ, সাণ্ডিল্যগোত্র - ভট্টনারায়ণ, ভরদ্বাজগোত্র - শ্রীহর্ষ, সাবর্ণগোত্র - বেগগর্ভ এবং বাৎস্যগোত্র - ছান্দড়, এই পঞ্চজন মণিতুল্য।

আর পঞ্চ ব্রাহ্মণের পাঁচ সহচর হলেন গৌতম গোত্রীয় - দশরথ বসু, সৌকালীন গোত্রীয় - মকরন্দ ঘোষ, বিশ্বামিত্র গোত্রীয়- কালিদাস মিত্র, সাণ্ডিল্য গোত্রিয় - পুরুষোত্তম দত্ত ও বিরাট গুহ। ইহার মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র দক্ষিণরাঢ়ে কৌলীন্য পান, গুহরা বঙ্গে কুলীন হইয়াছিলেন এবং দত্ত ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব স্বীকার করেন নাই বলিয়া কিস্কুলীন হন, প্রবাদে আছে যে দত্ত (সম্ভবতঃ নারায়ণ দত্ত সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন)।

'দত্ত কারো ভৃত্য নয়, শুন মহাশয়
সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি এই পরিচয়।'

যদিও এই উল্লেখিত রাজা আদিশূরের অস্তিত্বে ও রাজত্বকাল নিয়ে এ যাবৎ কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইনি খৃষ্টীয় ও অষ্টম থেকে দশম শতকের মধ্যে কোন এক সময়ে বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে এক সময়কার প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ বাবু রাজেন্দলাল মিত্র অভিমত প্রকাশ করেন যে, সম্ভবত ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বীরসেন নামে যে রাজা বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন তাঁকে আদিশূরের উত্তর পুরুষ বলা হলেও আসলে ইনিই আদিশূর। জনৈক বৌদ্ধ নৃপতিকে পরাজিত করে ইনি বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন।

বীজী পুরুষোত্তম দত্ত সদা শিব অনুরক্ত
কাঞ্চীপুর হইতে গৌড়দেশে,
শ্রীবিজয় মহারাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ
কুলাভাব হইল নিজ দোষে

আদিশূরের সভায় যে পঞ্চকায়স্থ বীর পুরুষ আসেন তার মধ্যে পুরুষোত্তম অন্যতম। সে কথা আগেই বলেছি, তিনি বটগ্রাম - শাসন লাভ করিয়া তথায় বাস করেন।

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী
অভিমান বলি দত্ত যান গড়াগড়ি ।।

উহার কিছু দিন পরে খৃষ্টীয় ১১ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রনশূর যখন দক্ষিণ রাঢ়ের (তক্কন্ লাড়ম্) অধিপতি, তখন কাঞ্চীপুর পতী মহারাজ রাজেন্দ্র চোল রাঢ় আক্রমণ করেন। সম্ভবতঃ সেই সময় ভরদ্বাজ গোত্রীয় অন্য এক পুরুষোত্তম

দত্ত আসেন সেই দিগ্বিজয়ী বীরের সঙ্গে বঙ্গে এবং ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া ভাগীরথী তীর বালীতে বসতি করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীর ঘটক গ্রন্থে আছে।

দত্ত বংশীয় রায়চৌধুরী পরিবারের প্রাক ইতিহাস

'দত্ত বংশের একদেশ কারিকা' মতে, নবম শতাব্দীর শেষভাগ, মতান্তরে দশম শতাব্দীর প্রথমাংশে শাণ্ডিল্য দত্ত বংশের বীজপুরুষ হরিপলাশ দত্ত কান্যকুব্জ, মতান্তরে মহোদয়শ্রীর অন্তর্গত উজ্জ্বনী হইতে গৌড়ে আগমন করেন। প্রাচীন কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায়, মঙ্গলকোটে শাণ্ডিল্য দত্তগণ বাস করিতেন। বল্লাল সেন বা তাঁর পরবর্তীকালে দত্ত বংশের যে ত্রিশটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে বটগ্রাম, নেওদা (নাওদা) এবং আটিসাড়ায় শাণ্ডিল্য দত্তগণের বাস ছিল। মঙ্গলকোট ছিল সে সময় বটগ্রাম সমাজভূক্ত।

'যশোহর খুলনার ইতিহাস' (পথম খণ্ড)-এ পাওয়া যায়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র ভিন্ন অপর কায়স্থেরা মৌলিক। এই মৌলিকেরা আবার সিদ্ধ ও সাধ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে দত্ত, দেব, কর, পালিত, সেন, সিংহ, গুহ দাস - ইহারা সিদ্ধ মৌলিক বা আটঘর। সেন রাজত্বে কুলীনদিগের সহিত শুধুমাত্র সিদ্ধ মৌলিক ঘরের আদান প্রদান চলিত। প্রবাদ আছে যে, ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন ঘর ব্রাহ্মণদিগের নিকট নতিস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বল্লালনীতির বিরোধিতা করায় ব্রাহ্মণদিগের নিকট নতিস্বীকার না করায় বিনয়াভাবে 'দত্ত' বল্লাল কর্তৃক নিষ্কুলীন হইয়াছিলেন। লালমোহন বিদ্যানিধি 'কায়স্থ কৌস্তভ'এ রাঢ় দেশে দত্তদের আগমন বার্তা গর্বের সঙ্গে এভাবে বর্ণনা করিয়াছেন -

'দত্ত কারো ভৃত্য নহে, সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি, করি তীর্থ পর্যটন।'

আবার দ্বিজ-ঘটক চূড়ামণি ১০০৮ সনে রচিত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকাতে বর্ণিত নিম্নের পংক্তি হইতে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় -

'দত্ত কারোর ভৃত্য নহে শুন মহীপাল।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম শুন নরপতি।
রাঢ় দেশ দেখিবারে আইলাম সংহতি।'

ইহা হইতে মনে হয়, গৌড়েশ্বর মহাপালের রাজসভাতে আমন্ত্রিত কোন একজন দত্ত বংশীয় কোন আদিপুরুষ সগর্বে এই কথা ঘোষণা করিতে সাহস করিয়াছিলেন।

মূল আলোচ্য বিষয় কায়স্থের বর্ণ এবং শাণ্ডিল্য দত্ত বংশের ক্রমবিকাশ। সুতরাং শাণ্ডিল্য দত্তের আদি সমাজ বা বাসস্থান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। প্রাচীন বটগ্রামের অবস্থিতি সম্পর্কে একাধিক মতবাদ আছে। বলা বাহুল্য বিপ্রদাস পিপলাই মনসামঙ্গল কাব্যে সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয়ে বলেছেন, তিনি 'নাদুড়্যা বটগ্রামে' জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত বটগ্রাম সম্বন্ধে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার অধীন বাদুরিয়া থানা এলাকায় এক বটগ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়। বাদুরিয়া (বাদুড়্যা) থানা এখনো আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই বাদুরিয়া অপভ্রংশে উক্ত নাদুড়্যা বটগ্রাম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

শিতিশচন্দ্র ঠাকুর-এর মতে, বটগ্রামের বর্তমান নাম বটরিয়া বা বটোরি। ইহা বর্তমান মালদহ জেলার গঙ্গাতটে (অক্ষঃ ২৪০৪৬৫৪´´ উত্তর ও দ্রাঘিঃ ৮৮০১৩ ৫০´´ পূঃ) অবস্থিত।

নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, কোন এক সময়ে উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত অজয় নদের পূর্বকূলে মঙ্গলকোটের ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে বটগ্রাম বিদ্যমান ছিল। এই স্থানে ইছেবড়গাঁ নামে পরিচিত একটি পল্লীও আছে. গ্রামটি প্রাচীন বটগ্রামের অপভ্রংশে 'বড়গাঁ' নামে পরিচিত হইয়াছে। এই গ্রামের পাশে ইছাপুর নামক গ্রাম থাকায় 'ইছেবড়গাঁ' নাম হইয়াছে। বড়গাঁর পূর্ব-পশ্চিমে ১ মাইলের উপর দীর্ঘ একটি সুবৃহৎ দীঘি এখনও প্রাচীন বটগ্রামের সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। এতবড় দীঘি বর্ধমান জেলার আর কোথও নাই।

বর্ধমান জেলাতে আর এক বটগ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়। এটি কাটোয়া থানাধীন গুসকরা ও ভেদিয়ার মধ্যে কল্যাণপুর-বটগ্রাম নামে পরিচিত। অনেক প্রাচীন লোকের ধারণা, সুপ্রাচীন বটগ্রাম অজয়ের গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ায় অপর একটি স্থল কল্যাণপুর-বটগ্রাম নামে পরিচিত হয়। পূর্ববঙ্গের কোন কোন প্রাচীন কুলপঞ্জিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা দক্ষিণ রাঢ় মধ্যস্থল অর্থাৎ বর্ধমান হইতে

আসিয়াছেন। বিস্তারিত পর্যালোচনায় মনে হয়, 'ইছেবড়গাঁ-ই' সম্ভবতঃ গৌড় রাজগণের সময়কার প্রাচীন বটগ্রাম। পণ্ডিতবর্গ মনে করেন, অজয় নদে বিলীন হওয়া বটগ্রামেই প্রাচীনকালে বিশিষ্ট দত্ত বংশীয়গণ বসবাস করিতেন। চৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র রামেশ্বর এই ইছা বটগ্রামে বাস করিতেন। কেহ কেহ 'বটগ্রাম'-এর অবস্থিতি বরেন্দ্র দেশে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। বঙ্গজ কুলপঞ্জিকা মতে বল্লাল সেন কর্তৃক ২৩ ঘর কায়স্থের কুল ও সমাজস্থান নির্ণয় কালে 'দত্ত' দিগের সমাজ বটগ্রাম নির্দিষ্ট হয়।

রাঢ় বঙ্গের দত্ত বংশের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ ও কুলপঞ্জিকা সমূহের সাহায্যে পূর্বে দেখানো হইয়াছে যে - দত্ত বংশীয়গণ ব্রাহ্মকায়স্থ। তথাপি, বঙ্গের (পূর্ববঙ্গের) কিছু অঞ্চলে বৈদ্য কায়স্থের বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য কায়স্থ শাণ্ডিল্য দত্তগণের সপক্ষে নিম্ন বর্ণিত তথ্যসমূহ দেওয়া হইল।

কলিকাতার 'বাণীমন্দির অনুসন্ধান বিভাগ' বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থ কারিকা এবং বিভিন্ন কুলজিগ্রন্থ, দত্ত বংশাবলী হইতে গবেষণা করিয়া বাংলা ১৩৬৩ সনে যে দক্ষিণ রাঢ়ীয় 'দত্তবংশের একাদশ কারিকা' প্রকাশ করেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় শাণ্ডিল্য গোত্রের দত্ত বংশের আদিপুরুষ হরিপলাশ দত্ত কান্যকুব্জ মতান্তরে 'মহোদয়শ্রী' অঞ্চলের 'উজনী' হইতে নবম শতাব্দীর শেষভাগে মতান্তরে দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়ে আগমন করেন।

বঙ্গের যে সকল স্থানে দত্ত বংশ উভয় শ্রেণীতে বিভক্ত, তাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইহাদের রাঢ়ীয় অপর শাখা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের কায়স্থ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কায়স্থ বৈদ্যের এই ভুল বোঝাবুঝির ফলে সমাজ জীবনে এক চরম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং উল্লিখিত তথ্যসকল পর্যালোচনা করিলে সকলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে শাণ্ডিল্য দত্ত মূলত কায়স্থ। এই তথ্যের সহিত কেহ সহমত পোষণ করিতে বা নাও করিতে পারেন। ইহা ছাড়া একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, দুই বঙ্গের শাণ্ডিল্য দত্ত বংশে যে সকল প্রাচীন অবস্থাপন্ন পরিবার ছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলের পূর্ব-পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারা জল-যুদ্ধে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ খ্যাতি

অর্জন করিয়াছিলেন। নৌ-যুদ্ধে পারদর্শিতার সুবাদে প্রাচীনকাল হইতে ইহারা গুপ্ত, পাল, সেন এমনকি মুলমান নৃপতিদের আমলেও রাজ সরকারে সান্ধিবিগ্রহিক, নৌসেনাপতি প্রভৃতি উচ্চ রাজপদে আসিন ছিলেন। বিশেষ করিয়া আকবরের রাজত্বে (মোঘল অমলে) বাংলার বেশিরভাগ জামিদারবঙ্গভূম্যধিকারিগণ ছিলেন কায়স্থ বংশীয়। ইহাও ক্ষত্রিয়ত্ব বা কায়স্থের চিহ্ন বহন করে। সুতোরাং প্রাচীন ব্রহ্মকায়স্থ বংশীয় শাণ্ডিল্য দত্ত কায়স্থ।

বাণীমন্দির অনুসন্ধান বিভাগ প্রকাশিত (বাং ১৩৬৩ সাল)। দত্ত বংশের একাদশ কারিকা' মতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দত্ত বংশের আদিপুরুষ হারিপলাশ দত্ত খ্রীঃ নবম শতাব্দীর শেষ অথবা দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কান্যকুব্জ, মতান্তরে মহোদয়শ্রীর অন্তর্গত উজনী হইতে গৌড়ে আগমন করেন।

ঐতিহাসিক গণনা অনুযায়ী (৩০ বৎসর হিসাবে) হরিপলাশ দত্তের আগমনকাল আনুমানিক ৮৯৫-৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। উক্ত কারিকা মতে, হারিপলাশ অবস্তন সত্যবান কাঞ্চননগর এবং পূর্ণানন্দ গৌড়েশ্বর বিজয় সেনের সময় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলী জেলার জয়পুর বাগাটী গ্রামে বাস করেন। তাঁহার অবস্তন নিত্যানন্দ দত্ত দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয়ভাগে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি সন্নিহিত 'নাওদা'তে (মতান্তরে বর্ধমান জেলার নওয়াদা) বসতি করেন। এই নিত্যানন্দ বংশীয় অবস্তন গণপতি দত্ত আটিসেয়াড়া এবং গণপতি বংশীয় পরমেশ্বর দত্ত (পরমেশ) চাঁদপাল-ও বাস করেন।

ধরা যাউক, পূর্ণানন্দ যদি ১০৯৫ সনে ২৫ বৎসর বয়সে জয়পুর বাগাটীতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে হরিপলাশ হইতে পূর্ণানন্দ আনুমানিক (১০৯৫-৯০৫ খ্রীঃ) ১৯০ বৎসর ব্যবধান অর্থাৎ ছয়ঙ্গসাত পুরুষ হইতেছেন। কারণ বৈদিক কুলগ্রন্থানুসারে গৌড় ও রাঢ়ে বিজয় সেন রাজত্ব করেন আনুমানিক ১০৭২ হইতে ১১১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত। কারিকায় চার পুরুষের নাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ দুইঙ্গতিন পুরুষ অজ্ঞাত। অপরদিকে জানা যায়, পরমেশ্বর দত্ত ১৪৭৫-৯৯ সালের মধ্যে পুরন্দর খাঁ হইতে সমাজ বন্ধন সভাতে গোষ্ঠিপতি উপাধি প্রাপ্ত হন। এই ক্ষেত্রেও পরমেশ্বর হইতে পূর্ণানন্দ পর্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর ব্যবধানে কম করিয়া তের পুরুষ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তালিকাতে আট পুরুষের নাম

পাওয়া যায় অর্থাৎ পূর্ণানন্দ হইতে নিত্যানন্দের ভিতর এক এবং নিত্যানন্দ হইতে পরমেশ্বর-এর ভিতর অন্ততঃ বার পুরুষের নাম পাওয়া যায় না।

বারুইপুরের ইতিহাস

২৪ পরগণার গণ্ডগ্রাম বারুইপুর ছিল বারুজীবী বা বারুইজীবী (পান চাষী) অধ্যুষিত এলাকা। স্থানীয় গ্রাম্য নাম বারিপুর। পান ব্যবসায়ী বারুই সম্প্রদায়ের বাস বেশী থাকায় নামটা হলো বারুইপুর। এই সম্প্রদায়ের বাস দুধনই ও মদারাট গ্রামে সবচেয়ে বেশী আছে, তবে মনে হয়, বারুইপুর পৌরসভায় ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত 'দত্ত পাড়ার' পাশে বসবাসকারী বারুইরা এখানে এই সম্প্রদায়ের আদি বাসিন্দা। এইটাই ছিল আদি বারুইপুর, তারপর কলকাতা নামটা যেমন ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হয়েছে, ঠিক তেমনি বারুইপুরও। আটিসারা, মোমিনাবাদ, মানিকতলা, পদ্মপুকুর, বলবন ইত্যাদি ছোট ছোট গ্রামের নাম ছিল, সেই নামকে আত্মসাৎ করে বারুইপুর আজ দক্ষিণ বঙ্গের একটি উজ্জল নাম। ৮২.৮ বর্গমাইল বারুইপুর থানা, প্রাচীন মদনমল্ল পরগণার অধীনে, এর উত্তরে সোনারপুর, দক্ষিণে জয়নগর ও মগরাহাট, পূর্বে ক্যানিং ও পশ্চিমে বিষ্ণুপুর থানা। এই হলো চৌহদ্দি, মোট গ্রাম সংখ্যা ১৬৯টি, ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১টি পঞ্চায়েত সমিতি, ১টি পৌরসভা। আর বারুইপুরের অবস্থানটি হলো - বিষুব রেখার কৌণিক দূরত্বে অক্ষাংশ ২২.৩৫ ৪৫ ডিগ্রি এবং দ্রাঘিমাংস ৮৮.২৫.৩৫ ডিগ্রি।

বারুইপুর গ্রামটি কতদিনের প্রাচীন, সঠিক ভাবে সে কথা জানার উপায় নেই, তবে পুরোনো বাজারের উত্তরে দোলমঞ্চর চূড়ার পূর্ব দিকে দেখা যায় ক্ষোদিত আছে ১৩৭০ সক অব্দ, ক্ত' অর্থাৎ শকাব্দ, খ্রীষ্টাব্দে হয় ১৪৫১, ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম জানা যায় এখানে মাটি ছিল। আবার ১৬ শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনসাবিজয়' পুথিতে সর্ব্বপ্রথম বারিপুরের নামটি পাওয়া যায়, আবার বারুইপুরের নাম পাওয়া যায় কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে, ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ঃ-

সাধুঘাটা পাছে করি সূর্য্যপুর বাহে তরী
টপাইল বারুইপুরে আসি ।।

মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের পুত পাদ স্পর্শে ধন্য বারুইপুর। ৯১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই ফাল্গুন অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচলে যাত্রাপথে মহাপ্রভু নদীয়ার শান্তিপুর থেকে বেরিয়ে আদিগঙ্গার তীর ধরে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় হরিনাম করতে করতে পদব্রজে সপারিষদ এগিয়ে আসছেন আটিসারা গ্রামের অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে। জায়গাটিকে মহাপ্রভুতলা বলা হয়। শ্রী চৈতন্যের নামানুসরণে। আর সারা রাত ধরে কীর্তনের আসরটি বসেছিল মহাপ্রভু তলার কিছু দূরে ঐ শ্মশানে। যার নাম 'কীর্তনখোলা'।

বারুইপুরের কাছেই আটঘরা গ্রামের মাটির তলা থেকে পাওয়া গেছে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ আমলের মুদ্রা ও নিদর্শন। পাশেই সীতাকুণ্ডু গ্রাম, শুঙ্গ, কুষাণ ছাড়া পালযুগের বিষ্ণুমূত্তি পাওয়া গেছে। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে গ্রাম দুটির অবদানের প্রচুর ঐতিহাসিক নিদর্শন বহু মিউজিয়ামে সংগ্রহে আছে। রামনগর গ্রামের একটি জৈন দেবীর প্রস্তর মূর্তি, গত শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত বিড়াল ও পুরন্দরপুরে জোড়া মন্দির, বেনিয়াডাঙ্গার মন্দির, ছাঁটুই পাড়ার জোড়া - বাংলার মন্দির বা ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে নির্মিত বারুইপুর কাছারী বাজারের বিশালক্ষ্মী দেবী মন্দির, কল্যাণপুরের কল্যাণমাধব বা বারুইপুর থানার সীমান্ত গ্রাম পেটুয়া, সেখান কার মসজিদ তলায় পাঠান আমলের দ্বিতম মসজিদ, আবার বারুইপুর থানা পূর্ব সীমান্ত বেলেগাছি, চারিদিক ফাঁকা, কেবল ধু ধু মাঠ, যাকে বলে বাদা। মানুষ্য বসতিহীন বিস্তীর্ণ এই এলাকার মধ্যে কী করে এলো মানুষের এত কবর? শতাধিক কবরের আশে পাশে ছড়িয়ে আছে মাটির গৃহস্থলির সাজ-সজ্জা - চেরাগ, কলকে, খেলনা ঘোড়া, থালা, গেলাস, আরো কত কি। কি করে এলো এসব? তবে কি এই সেই 'বেলেরজঙ্গল'—যেখানে মোবারক গাজী আস্তানা গেড়েছিলেন খৃঃ ১৭শ শতাব্দীতে। ধপধপি গ্রামের ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণরায়ের মন্দিরের কথা বাদ যাবেই বা কেন?

কালের সাক্ষী হয়ে যুগ সঞ্চিত - মন্দির - মসজিদগুলি এই অঞ্চলের প্রাচীন পুরাকীর্তির নিদর্শন হয়ে আছে। ইস্ট ইণ্ডি য়া কোম্পানীর আমলে বারুইপুর মহকুমার মর্যাদা পায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, কেবলমাত্র ২৪ পরগণা জেলার নয়, সমগ্র অবিভক্ত বাংলার মধ্যে সর্বপ্রথম আদালত বসে বারুইপুরে, 'মানিকতলা মুনসেফী

বিচারালয়'। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, মানিকতলা গ্রামটি কোথায় ছিল? সমাধান দুরূহ, বহুদিনের লালিত জনশ্রুতি এই যে, প্রথম আদালত বসে বারুইপুরে। বর্তমান সাব-ডিভিশানাল অফিসের পাশে - যেটা পুরোনো পোষ্ট অফিস নামে পরিচিত সেখানে। ঘরের মধ্যে বিচারকের বসার মতো বেদী ছিল। পিছনে লম্বা কুঠুরি, উত্তর দেওয়ালে জেল - গরাদের মত লম্বা লম্বা জানালাও ছিল। সেটা কয়েদখানা বলে অনুমান করা হয় এবং বাড়ীটির উত্তরে 'উকিলপাড়া' যেখানে উকিলদের বাসস্থান ও জেলখানা ছিল বলে প্রবল জনশ্রুতি ছিল। তবে কি মানিকতলাকে গ্রাস করেছে উকিলপাড়া, যেমন আটিসাড়াকে করেছে পুরাতন বাজার ও শাঁখারি পাড়া।

বারুইপুর মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় ২৯যে অক্টোবর ১৮৫৮ সালে। বারুইপুরেই ছিল মহকুমা সদর। প্রথম মহকুমা শাসক হন মিঃ ষ্টুয়ার্ট কলিভিন বেলী। এই সময় তিনি নিযুক্ত হন মহকুমা কালেক্টার পদে। মিঃ বেলী সাহেব বারুইপুরে আসেন সল্ট এজেন্ট হয়ে। পরে তিনি বাংলার গভর্নর হন। এই মহকুমার পরমায়ু ছিল ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত।

এই বারুইপুরে মানিকতলার আদালত কক্ষেই একদিন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি হলো এক আকাশে দুই সূর্যের মিলন। আদলত কক্ষ। বিচারকের আসনে তরুন বিচারক। বুদ্ধিদীপ্ত, গম্ভীর মুখশ্রী, পাতলা দুইটি চাপা ঠোঁটে আরও গম্ভীর দেখাচ্ছে - পদমর্যাদার গুরুত্বে গম্ভীরতর। মামলা চলছে, সাওয়াল করে চলেছেন একজন বিলেত ফেরত বাঙালি ব্যরিস্টার। পোশাকে - আশাকে, হাব ভাবে, কথা - বার্তায় যেন খাঁটি ইংরেজ, বিচারক অপেক্ষা ১০ বছরের বড়। বয়সে নবীন হলেও বিচারক বেশ কড়া ধাতের বলে পরিচিত। বিচক্ষণতা এবং ন্যায় নিষ্ঠার জন্য বহু গল্প গুজব লোকের মুখে ফেরে, হাব ভাবে একটি ডোন্ট কেয়ারী মনভাব আছেই। তার ওপর আবার সম্পূর্ণ নতুন আদিগঙ্গা নামক কি এক কাহিনী লিখে আলোড়ন তুলেছেন সারা বাংলার বিদগ্ধ সমাজে।

এহেন বাঘা হাকিম ও আজ বেশ বিচলিত। কেননা সাওয়াল করছেন যে আইনজীবি, তিনি যে স্বধর্মত্যাগী, শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে ধমক খাওয়া, পরিবার-

পরিজনের বন্ধনমুক্ত। আবার বাংলা ভাষায় অভূতপূর্ব এক ছন্দে কাব্যরচনা করে বাংলাসাহিত্যে মহাবিপ্লব ঘটিয়েছেন। সারা দেশের সাংস্কৃতিক গগনের উজ্জ্বলতর জ্যোতিষ্ক রূপে তিনি তখন দেদীপ্যমান। তাই বলা হয় এক আকাশে দুই সূর্য্যের মিলন ঘটেছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উনবিংশ শতকের প্রথমে রাজস্ব ও প্রশাসন সংক্রান্ত কয়েকটি অফিস বারুইপুরে চালু করেন। এই সময় নিগম মহলের এজেন্ট প্লাউডন ১৮২০ সালে একটি বিদ্যালয় বারুইপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিন বছর পরে ১৮২৩ সালে বিদ্যালয়টি মিশনারী স্কুলে পরিবর্তন হয়। খ্রীষ্টান মিশনারী ধর্মপ্রচারের জন্য সেই সময় বারুইপুরে একটি গীর্জা নির্মাণ করেন। এই সময় থেকে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব বিশেষ করে পড়ে।

বারুইপুরে ১৮৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শিখরবালী প্রাইমারী স্কুল। ১৮৫৭ সালে ধপধপি স্কুল, ১৮৫৮ সালে বারুইপুর হাই স্কুল। বারুইপুরের থেকে দক্ষিণাঞ্চলে যাবার একটিমাত্র প্রাচীন রাজপথ ছিল তার নাম 'দ্বারীর জাঙ্গাল'। হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত। অষ্টাদশ শতকে কুলপী রোড তৈরী হয়। পদ্মপুকুর থেকে আমতলা যাবার রাস্তা সেদিনও ছিল একটি মেঠোপথ। স্বাধীনতার পর তা তৈরী হয়, আর ক্যানিং রাস্তা। এটা তৈরী হয় অনুমানিক বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে। ১৮৮২ সালের ১০ই জুলাই শিয়ালদহ থেকে বারুইপুর পর্যন্ত রেলগাড়ী চলে। বারুইপুর থেকে ডায়মণ্ড হারবারের রেল যোগাযোগ শুরু হয় ১৮৮৩ সালের ২৫শে এপ্রিল। বারুইপুর থেকে লক্ষ্মীকান্তপুরের রেল যোগাযোগ শুরু হয় ১৯২৮ সালের ১৪ই নভেম্বর।

বারুইপুর রাসমাঠে হিন্দু স্বদেশী মেলা অনুষ্ঠিত হয় বার তিনেক (১৮৭১-৭৪)। পরে বিষদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগের জন্য ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুর রাসমাঠে একটি সভা হয়।

১৯০৮ সালে ১২ই এপ্রিল বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য বর্তমান বারুইপুর আদালতের সামনে একটি সভা হয়। শ্রী চৈতন্য, শ্রী অরবিন্দ, বিপিন চন্দ্র পাল, মাইকেল মধুসুদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূণ্য পদচিহ্নে ধন্য বারুইপুর আজ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় একটি প্রতিষ্ঠিত মহকুমা কেন্দ্র।

রায়চৌধুরী পরিবার আদিযুগ

পুরুষোত্তম দত্তের অন্যতম বংশধর হলেন, হরিপলাশ দত্ত, রায়চৌধুরী পরিবারের পরমপুরুষ উজ্জ্বনিতে বসবাস করতেন। প্রশ্ন উঠতে পারে উজনি কি উজ্জয়িণী, নাকি অন্য কোন দেশ। উত্তর হলো উজনি হলো বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার এক বর্ধিষ্ণু প্রাচীন স্থান। আর আগেই বলা হয়েছে পুরুষোত্তম দত্ত বটগ্রামের শাসন করার অধিকার পেয়েছিলেন। হরিপলাশ দত্ত তার পুত্র সত্যবানকে নিয়ে কাঞ্চন নগরে বসবাসের জন্য চলে আসেন। কাঞ্চন নগর কোথায়, মনে হয় বর্তমান কাঁচরাপাড়া। কাঞ্চন নগর - কাঞ্চনপল্লি - কাঁচড়াপাড়া সত্যবানের চতুর্থ বংশধর নিত্যানন্দ বক্তা হিসাবে খ্যাতিলাভের ফলে বিভিন্ন স্থানে যান। তাঁর পুত্র গণপতি আটিসেয়াড়াতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। আটিসেয়াড়া কোথায় ? এই গ্রামটি হওড়া ও হুগলির কাছে নিজস্ব অস্তিত্ব নিয়ে আজও অবস্থান করছে। ইহা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গা। গণপতির চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নৌবাহিনীর সাধারণ সৈনিক হিসাবে যোগদান করেন। তার পুত্র মনোহর ঐ একই কার্যে নিযুক্ত হন। মনোহরের পুত্র কংসারী তাঁর পুত্র পরমেশ্বর একই কর্মে নিযুক্ত হন। পরমেশ্বরের কর্মদক্ষতার গুণে নবাব তাঁকে চাঁদপাল ঘাটে প্রেরণ করেন। চাঁদপাল ঘাটের বর্তমান অবস্থান কলিকাতা। তিনি সেখানে বসবাস শুরু করেন। পরমেশ্বরের প্রথম পুত্র গোপীনাথ চাঁদপালে বৃদ্ধ পিতার কাজে নিযুক্ত হন। গোপীনাথের পুত্র কৃষ্ণদাস নবাবের কাছ থেকে দক্ষিণে সরকার সাঁতগাও একটি পরগণা (মেদনমল্ল) যৌতুক পান। তাঁর পুত্র জগদীশ নিজের আধিপত্য বিস্তার ছাড়াও দক্ষিণের অনেক জায়গা করায়ত্ত করেন। এই বংশ তালিকা থেকে আমরা অবগত হতে পারি যে, কৃষ্ণ দাস -এর সময় হতে এই বংশের যাবতীয় উত্থান, তিনি কার নৌ-সেনাপতি? এ বিষয়ে রায়চৌধুরী বাড়ীর 'কুলগাথা' কি বলে, ... দেখা যাক।

'.......... গোপীনাথ সুচরিত্র
সুবিখ্যাত পুত্র তার,
বীরত্বের পুর্ণাধার,
গিয়াসুদ্দীন মহাম্মদ হোসেন গৌড়পতি ?

নৌ - সেনার অধিপতি - কৃষ্ণদাস
ইহার সময়ে অতি
ধনবৃদ্ধি পায় বারমাস ।।

সম্প্রতি একটি ছাপান লিখিত পারিবারিক ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায়, মুঘল আমলে বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন .... উত্তরে আদিগঙ্গা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর - মোহনা, পূর্বে - মাতলা নদী ও পশ্চিমে হুগলী নদী। দক্ষিণ অংশের জায়গীর প্রাপ্ত হন হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ শাহের নিকট হইতে। (১৫৩৩-৩৮) মধ্যে। এই ইতিবৃত্তটি আবিস্কার হয়েছে রায়চৌধুরী পরিবারে নন্দলাল রায়চৌধুরী ব্যবহৃত একটি পুরাতন টিনের বাক্স থেকে এই ইতিবৃত্তটি রচিত হয়েছিল, নন্দলাল রায়চৌধুরীর সহিত বিশ্বকোষ রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসুর ১ম কন্যা মৃণালীনি দেবীর বিবাহ উপলক্ষে।

এরপর এই বংশের কৃষ্ণদাসের নাতি রাজবল্লভ দত্তের সম্বন্ধে আলোচনা করব। তার সম্বন্ধে 'কুলগাথায়' কি বলা আছে তা আমরা দেখি -

জগদীশ তদীয় সুত
রাজবল্লভ তাঁর পুত
অতুল ঐশ্বর্য্য অধিকারী।
বিশেষ বদান্য গুণে
গৌড়রাজ শুজা স-সম্মানে
'রায়ো'পাধি দেন যত্ন করি।
দান কীর্ত্তি বহুদূর
বর্তমান রাজপুর
তদীয় নামেতে সৃষ্ট হয়।

এই 'কুলগাথার' সঙ্গে 'বাণীমন্দির' অনুষ্ঠান বিভাগ থেকে প্রকাশিত বারুইপুরের রায়চৌধুরী বংশের বংশাবলী মিল পাই ও জানতে পারি -

রাজবল্লভ স্বীয় কার্য্যদক্ষতার জন্য নবাব দরবার হইতে 'রায় চতুর্দ্ধরীণ' উপাধি ও বিশাল ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়া রাজপুরস্থ অট্টালিকার চতুস্পার্শ্বে সুবৃহৎ গড় নির্মাণ পূর্ব্বক শ্রী আনন্দময়ী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব শুজা হলেন শাহাজাদা

শুজা (১৬৩৯ - ৬০) বাংলার নবাব। গৌর অধিপতি বাংলার নবাব সুজা, সুজার (১৬৩৯ - ৬০) বাংলার নবাব হয়েছিল, তারপর রাজপুর গ্রামটি স্থাপিত হয়, তাই ১৪৯৫ এর মনসাবিজয় কাব্যে রাজপুর নাম পাই না।

এছাড়াও বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের কাছারী বাড়ীর (রাজা রাজবল্লভ ভবন) দেওয়ালে টাঙানো বংশ তালিকায় দেখা যায় রাজবল্লভ (রাজপুর) ইনি রায় উপাধি পান। এছাড়াও বাণীমন্দিরে প্রকাশিত বংশ তালিকায় রাজবল্লভ (রাজপুর) দেখা যায়। বাগবাজার স্থিত নন্দলাল বসু অখণ্ড বাংলার কায়স্থদের বংশ তালিকা প্রস্তুত করেন, এর জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি তৈরী করেন তার নাম বাণীমন্দির। এই বাণীমন্দির থেকে প্রায় সমস্ত কায়স্থদের বংশ তালিকা মুদ্রিত হয়।

উপরোক্ত বংশতালিকা থেকে প্রমাণ হয় যে, রাজপুর নামটি রাজবল্লভ দত্ত (রায়) এর নামানুসারে। এই প্রসঙ্গে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই (মনসা বিজয়' কাব্যে) দক্ষিণ -এর কিছু স্থানের নাম দেখতে পাই।

ধনস্থানে এড়াইল বড় কুতু হলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে ।।

এখানে বারুইপুরের নাম আছে অথচ রাজপুরের নাম নাই। কারণ গৌড় অধিপতির সময় তিনি 'রায়' উপাধি পান। প্রশ্ন আসতেই পারে, সম্রাট আকবর কি মেদনমল্ল পরগণার জমিদারী বদল করেন নাই কেন, অনুমান কৃষ্ণদাসের পরিবারের সাথে নবাব দরবারে যাতায়াত ছিল বা কৃষ্ণদাসের নবাবের প্রতি আনুগত্য জমিদারি রক্ষার অন্যতম কারণ। তার আগে থেকেই মেদনমল্ল পরগণার জায়গীর লাভ করেন, কৃষ্ণদাস ১৫৩৩-৩৮ এর সময় বাংলার গৌড় অধিপতি গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ শাহ-এর নিকট থেকে জায়গীর পান। ১৫৮২ তে সম্রাট আকবরের রাজত্বের সময় বাংলার জরিপ হয়। এই জরিপে কৃষ্ণদাসের প্রাপ্ত জায়গীরটির নাম হল মদনমল্ল পরগণা। কারণ প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর রাজা মানসিংহ (১৫৯৪ - ১৬০৬) বাংলার শাসন কর্তা হন। তিনি গুরু কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্তকে ৬টি পরগণা দেন। এইগুলি হল - (১) খাসপুর (২) মাগুরা

(৩) পাইকান (৪) আনোয়ারপুর (৫) হাতিয়া (৬) গড় (অর্ধাংশ), কলিকাতার (অর্ধাংশ) এবং ১৬০৬ খ্রীঃ দিল্লীরশ্বর জাহাঙ্গীর-এর নিকট থেকে নদিয়ার রাজ ভবানন্দ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ ১৪টি পরগণা পান। সেখানে মেদুই মুল (মেদনমল্ল) পরগণার নাম নাই। অথচ ১৫৮২ খ্রীঃ সম্রাট আকবরের সময় তাঁর হিন্দু সেনাপতি 'তোডরমল' বাংলা সুবাতে প্রথম জরিপ করেন। যে জরিপের নাম 'আসলি - জমা - তুমার'। এই জরীপের বর্ণনা দিয়েছেন সম্রাটের মন্ত্রী আবুল ফজল তার সুবিখ্যাত 'আইন - ই - আকবরীতে'। এই গ্রন্থে প্রথম দেখতে পাই মেদনমল্ল পরগণা সাতগাঁওর অধীনে যার খাজনা তখন ছিল ১,৮৬,২৪২ দাম (আকবর শাহী মুদ্রা)।

এখান থেকে প্রমাণ করা যায় সম্রাট হোসেন শাহ-এর পুত্র গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ শাহ (১৫১৩-৩৮) এই সময় সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে (মেদনমল্ল পরগণা) যাহা ছিল নদী নালা এলাকা সেখানে কার নৌসেনাপতি কৃষ্ণদাসকে জায়গীর দিয়েছিলেন বলেই, পরবর্তীকালে মান সিং মেদনমল্ল পরগণার জমিদারী বড়িষার সার্বর্ণ চৌধুরীদের বা নদিয়ার রাজপরিবারকে পুরস্কার স্বরূপ দিতে পারেন নাই। মনে রাখতে হবে যে, ঐতিহাসিক সত্য প্রতাপাদিত্যর পরাজয়ের পরই এই পরগণাগুলি পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল (আনুমানিক ১৬০৬ থেকে ১৬১০ এর মধ্যে) মনে রাখতে হবে যে হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ শাহের নিকট হইতে মেদনমল্ল পরগণার যৌতুক পান। গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ গৌড় অধিপতি ছিলেন (১৫৩৩-৩৮)। এখানে কিন্তু মিলে যায় 'কুল গাথার সঙ্গে, সেখানে পরিস্কার বলা আছে, গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ হোসেন গৌড়পতি। সেই সেনার অধিপতি - কৃষ্ণদাস। এই সময়ে অতি ধনবৃদ্ধি পায় বার মাস। প্রশ্ন আসতেই পারে সম্রাট আকবর মেদনমল্ল পরগণার জমিদারী বদল করেন নাই কেন? কৃষ্ণদাসের পরিবারের সাথে নবাব দরবারে যাতায়াত ছিল বা এই বংশের নবাবের প্রতি অনুগত ভাবে জমিদারী রক্ষা অন্যতম কারণ।

রাজা মদন রায়

রাজা রাজবল্লভের পুত্র এই বংশের ১৬শ পুরুষ মদন রায় এবার আমাদের আলোচ্য বিষয়ে প্রথমেই আমরা মদন রায়ের কাল নিয়ে (নব পর্যায়ে) 'সোমপ্রকাশে'

পৌষ - ফাল্গুন মত দ্বৈততা দেখা দিলে - কালিদাস দত্ত (যিনি দঃ ২৪ পগণায় প্রথম ঐতিহাসিক) তার মন্তব্যটা শুনি। মদন রায় শায়েস্তা খাঁর আমলের লোক। গাজীর গান সঠিক। ১৫ই চৈত্র ১৩৬৫। বিনয় ঘোষ মহাশয় বলেন মদন রায় যদি বর্তমান পুরুষ থেকে দশম পুরুষ হন, তাহলে ১০প্র ২৫ বছর অর্থাৎ প্রায় ২৫০ বছর আগেকার লোক ছিলেন। তাতে আমার মনে হয় তিনি মুর্শিদকুলি খাঁ আমলের লোক। যা হোক অবার আমরা রায়চৌধুরী বাড়ী কুলগাথায় একটু চোখ বুলাই।

রূপে রবি শশী প্রায়
মদন শ্রীমন্ত রায়
পবিত্রলা বল্লভের ঘর।
মদন, প্রবল অতি বারো ভুঞা রাজা খ্যাতি
দিয়া তুষ্ট দিল্লীশ্বর।
পারক্রম দেখি তার নবাব শায়েস্তা খাঁর
সেনাগণ অসিলেক সাজি।
এ বিপদে রক্ষা তার করিলেন সদাশয়
মাহাত্মন মোবারক গাজী।

'কুলগাথা' অনুযায়ী প্রমাণ হয় মদন রায় শায়েস্তা খাঁর সময়কার লোক এবং এই সময় মোবারক গাজীর সহিত এই বংশের সম্পর্ক। এবার গাজী সাহেবের গান যাহা আমার পিতৃদেবের দাদামহাশয় প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক ১৩৩৫ সনে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১ম সংখ্যায় প্রকাশ হয়েছে। তা হুবহু তুলে দিলাম এই গাজীর গানে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমাণ করেছেন যে মদন রায় - শায়েস্তা খাঁর সময় এর লোক। গাজীর গানে এই প্রসঙ্গে রাজপুরের কথাই ধরি, তবে দেখব যে বঙ্গে দাক্ষিনাত্য বৈদিক সমাজ নামক বইতে শ্রী কেশব ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি লিখেছিলেন ....

বখতিয়ার খিলিজী যখন গৌড়দেশ জয় করেন, তখন অনন্তরাম কণ্ঠাভরণ মহাশয় মুসলমান - অত্যাচারে ধর্ম্মহানির ভয়ে গৌড় হইতে পানায়ন করেন।

প্রথমে তিনি কোথায় গিয়া বাস করেন, আহার কিছুই জানা যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার তিন পুত্র সপরিবারে এক বিধবা ভাগ্নীসহ রাজপুরের নিকটস্থ মহামায়ীতলা নামক স্থানে আসিয়া গঙ্গার তীরে বাস করেন। তদপর তাঁহার বংশধরগণ এই রাজপুর গ্রামে ও অন্যান্য স্থানে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

রাজপুর গ্রামটি গঙ্গার পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যখন রাজপুরের (বর্ত্তমান বারুইপুরের) দশ-আনি চৌধুরী মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ মদন রায়চৌধুরীকে বাকি রাজস্বের জন্য ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া যান, তখন তাঁহার পুরোহিত রমাবল্লভ বেদবাগীশ সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে কোন রাঢ় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের বাটীতে থাকিতেন এবং প্রতিদিন নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে মৌলবাদী দিগের সহিত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করিতেন। এইরূপ তর্কে মৌলবাদীগণকে পরাস্ত করায়, নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পেঁচাকুলী পরগণা জায়গীর স্বরূপ দান করেন। কিন্তু তিনি মুসলমানের দান গ্রহন করিতে অস্বীকার করায়, তাহার যজমান মদন রায়চৌধুরীকে দিয়া বলিয়া দেন যে, 'তুমি ইহা তোমার পুরোহিতকে দিবে। শোনা যায় তিনি মদন রায়র নিকট হইতেও গ্রহণে অস্বীকার করায় মদন রায় তাহার পরিবর্ত্তে রাজপুর দক্ষিণ পাড়ায় পঞ্চাশ বিঘা জমি তাহাকে দান করেন। সেই পাঞ্জাসমেত দানপত্র এখনও তাঁহার পুরোহিত বংশের হস্তগত আছে। উক্ত পাঞ্জাটি বিনয় ঘোষ ও দেখেননি পাঞ্জাটি আমি বহু অনুসন্ধানের পর দেখতে পাইনি। পাঠাগারে বসে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে লিখে দেন তিনি হয়ত 'মদন পালা' বা গাজীর গানের হদিস পান নাই তাই তিনি মদন রায় এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের সময়ের লোক বলেছেন। এবার আমরা আলোচনা করব খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচিত রায়মঙ্গল কাব্য নিয়ে। কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ রাজা মদন রায়ের সময়ে রাজপুরের সান্নিধ্যে আদি গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত, বড়দহ (বর্তমান বড়দা) নামক স্থানে দেবদত্ত নামে জনৈক বণিক বাস করতেন। তিনি বাণিজ্যার্থে বিদেশে গিয়ে নিরুদ্দেশ হন। কিছুকাল পরে তাঁর পুত্র পুষ্প দত্ত তাঁহার অন্বেষণে আদিগঙ্গা পথে নৌকাযোগে বঙ্গোপসাগব মধ্যস্থ তুরঙ্গ নগরে (বর্তমান সিংহল) গমন করেন। সেখানে তাঁর পিতা কারারুদ্ধ

ছিলেন। দেবতা দক্ষিণ রায়ের কৃপায় তিনি সেখান থেকে তাঁহাকে উদ্ধার করে দেশে নিয়ে আসেন।

ঐ কাহিনীতে পুষ্পদত্তর তুরঙ্গ নগরে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন কালের নানারূপ ঘটনার বিবরণের মধ্যে রাজা মদন রায়ের প্রসঙ্গ আছে। উহাতে দেখা যায় পুষ্প দত্ত প্রথম পিতৃ অন্বেষণে যাইবার অনুমতি গ্রহণের জন্য রাজা মদন রায়ের সকাশে গমন করেন এবং সেখানে তাঁহার সহিত রাজা মদন রায়ের কথোপকথন হয়। উহার কিয়দংশ এইরূপ ঃ

'দিব্য সিংহাসন মাঝে কৌতুকে বসিয়া আছে
মদন নৃপতি গুণাকর ।
বাহিরে রাখিয়া খুড়ি গলায় বসন জুড়ি
প্রণাম করিলে সদাগর ।।
শিসু অতি মনোহর দয়াল নৃপতি বর
বাইল আপনার পাশে ।
রূপজিনি রতিনাথ দেহে বুলাইল হাত
আগমন কিহেতু জিজ্ঞাসে ।।
বদন জিনিয়া বিধু বলে পুষ্পদত্ত সাধু
অবধান কর গুণনিধি ।
দুখের অবধি নাই সদা মনস্তাপ পাই
আমারে বিমুখ বড় বিধি ।।

পুষ্পদত্তের এই সকল কথা শুনিয়া রাজা মদন রায় তাঁহার পিতা ফিরিবেন এই আশ্বাস তাঁহাকে দেন ও দুঃখ ত্যাগ করিয়া গৃহে থাকিতে বলেন এবং অল্প বয়সে বিপদ সঙ্কুল পথে দেশান্তরে যাইতে নিষেধ করেন, কিন্তু তদুত্তরে পুষ্পদত্তর মুখে তিনি পিতার বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছেন না এবং সে কারণ বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করিবেন এইরূপ বাক্য শুনিয়া উদ্বিগ্ন হন। তখন তিনি গণক ডাকান ও পুষ্পদত্তের গমনের শুভ দিন স্থির করিয়া প্রসাদে তুষ্ট করেন। এইরূপে রাজা মদন রায়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া পুষ্পদত্ত সাতখানি

সমুদ্রগামী ডিঙ্গা সজ্জিত করেন। শুভদিনে বড়দাহ হইতে আদিগঙ্গার পথে যাত্রা করেন।

নগেন্দ্রনাথ বসুর গাজী গানের প্রথমেই আমরা কবি রামচন্দ্র মুখটি রচিত 'হর পার্ব্বতী মঙ্গল গ্রন্থ ও গাজীর গান নিয়ে আলোচনা করছি ও গাজীর গান নিয়ে আলোচনা করছি। এরপরই আমরা অমরকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী - সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ৮৬ বর্ষ ২য় - ৩য় সংখ্যায় রচিত 'মদন পালা' নিয়ে আলোচনা করে দেখি সেখানে কি আছে। শ্রী চক্রবর্ত্তী লিখেছেন -

মদন পালা একটি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। তুলোট কাগজে হাতে লেখা এই পুঁথিটি আছে কলিকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' পুঁথি সংগ্রহশালায়। নং. ৯৩৪ । পৃষ্ঠা সংখ্যা ১ থেকে ১৭ পর্যন্ত। মাপ আনুমানিক ১ ফুটপ্র ৪ ইঞ্চি। প্রথম ও শেষ দিকের অনেক পৃষ্ঠাই একেবারে ছিন্ন ভিন্ন। সমগ্র পুঁথিটির অবস্থা অতিশয় জীর্ণ। অনুমিত হয়, এর আয়ু আর বেশী দিন নেই। পাঠোদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন, ততোধিক কঠিন অক্ষরগুলিকে চেনা। একেকটি শব্দকে নিয়ে বহুক্ষণ ধৈর্য ধরে ভাবতে হয়। তথাপি সমগ্র শব্দের অর্থ উদ্ধার করা যায় নি। সেই অনুদ্ধারিত শব্দের পাশে '? ' এই প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া হইল। যে স্থানগুলি কীটদ্রষ্ট বা ছিন্ন, সেখানেপ্রপ্র এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হইল। উল্লেখ্য যে সেকালে 'ল' অক্ষর লেখা হতো দন্ত্য ন -এর মতো করে এবং তলায় একটি ফুটকি দেওয়া হতো যথা - 'নে'। অনেক শব্দের সঙ্গে ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিনাঞ্চলের উপভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন আউলে (আউলিয়া), তিন যুনি (তন সনের), ছকিয়া (শুকিয়ে), ইরশেল (ইরশাল), বেটে চোত (অশ্লীল গালি বিশেষ) প্রভৃতি। পুঁথির মধ্যে 'বলি তোমার তরে' বা 'বলি তোমার কাছে' .... বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলি এই জেলার দক্ষিণাঞ্চলে গীত পীর - গাজী সম্পর্কিত পালা গানে (লোকসঙ্গীতে) ও শোনা যায়। অনেক স্থানে পঙক্তি গুলি পারম্পর্যহীন। সেজন্য স্তুব এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে অর্থবোধাত্মক নির্দেশিকা দেওয়া রইল। পুঁথিতে তিন ব্যক্তির হস্তাক্ষর স্পষ্ট বোঝা যায়। বানানে অশুদ্ধি বিস্তর এবং পুনরুক্তি দোষও আছে। যা লেখা আছে, হুবহু তাই মুদ্রিত হলো। কেবল অর্থবোধের জন্য পাদটীকায় দুর্বোধ্য শব্দগুলির অর্থ দেওয়া রইলো।

আমরা আমাদের আলোচনায় পুনরায় প্রবেশ করি পূর্বেই মদনপালা নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার মদন পালাটি মূল পুঁথি থেকে তুলে দিলাম।

'ঘুটুরেতে বসে গাজাতল আকাটায় (?)
নবাব সারিত্তে খা এসেচে ঢাকায়,
ঢাকার কোটেতে এসে নবাব বসিল,
বারোভূমে জমিদার সব মজাই এ নিল ;
ঢাকা কোটে নবাব বসে নাম সারিত্তে খাঁ
ইনসাব আদালত নবাব কিছু করে না,
জমিদার মাজি এ নবাব অনেকেই খতি
তজবিজ তহ্য নাই (?)
নাই তার পায় নাগায় বেড়ী,
বারোভূমে জমিদার কে বন্দ খেনা দিল (?)
মেদনমল্যের কাগজ নবাব দেখিতে নাগেল,
দপ্তর কুলে রোকতুলে নবাব করে লেখা জোখা,
মদন রায় বাকী দেখে তিন যুনী টাকা।
(এরপর অন্য হাতের লেখা)
রাজা বলে এমত কালে এখঅনে আছে কে,
উকিলকে আনি এ দরবারে হাজির করে দে ।।
এচাই হুকুম জখন নবাব আউলে করিলো ;
লান খাঁ নামেতে পেত্রদা তখন উটে খাড়া হইল।
জামা জোড়া পেদে মঙ্গ (?) পিট পরে চার ;
দেখিতে অদবূত অত্তি দোষ আকে নাম ;
নবাবি দন্ত মঞ্জ বা দিলো (?) মাথায় ;
উকিলকে আনিতে শেই ধাউড়ে চলে যায়।
দন রায়ের উকিল দেখে বাশাবাড়ি ছিলো ;

নবাবে ধাউড়ে এশে তথা পৈছিলো ঃ কিশোর ;
ধাউড়ে বলছি মেরা ; যুন মেরা রায় ;
মোর তলব হয়েছে তোরা হাজির এশে হয়,
প্রাণ উতে পেলো উকিলের করে হায় ২ ;
এতদিনে পরে হলো বুঝি নবাব আনার দায় ;
প্রাণ হাতে করি উকিল দরবারেতে জায় ;
নবাবের সামনে এনে খাড়া করে দেয় ;
নবাব বলে কিশের উকিলে করো নাম তোমার কি ।
তিনযুনি খাজনা কেন হুজুরে এনো নি ;
উকিল বলে নবাব সাত্রেব ধরি তোমার পা ;
তিন শেনে মেদনমল্য ধান্য হয় না ;
দানা বিনে মেদনমল্য প্রজা ছবি এ মনোঃ ।।
তেকারোনে খাজনা তোমার হুজুরে না এনোঃ ।
নবাব বলে এমত কালে এখানে আছে কে ।
তসিরা করিএ খজেনা মায়াইয়ে দে ;
চালিয়াত বলে মেরা প্র যুন ফরমাণী ।
কোনো জমিদারের লোক তেরা কও দেখি যুনি ;
মস্তান পরে বলিছে বাবা শুন মেরা
সন্তোষ রায় চৌধুরির লোক তোমার জান নাই ;
খাজনা করিয়া মোরা জাইতেছি ঘরে,
ইরশেল মারিয়া নেমে কি রাহার উপরে ।।
ওব খবর পাঠাইয়া দিবো নবাবের দরবারে ।
(ঢাকার কারাগারে বন্দী জমিদারদের শাস্তিদানের বাঙ্ময় চিত্র)
কারু কোলে রেখেছে সিংহমাছের গাড়ি,
পিষ্ঠে ডলে মোরে বেতের বাড়ি ;

অহ রায় বেত্র আছে দুটি দসত্ত করে জোড়া
মেদম মল্যের কাগজপ্রপ্র তো করে নাড়া চাড়া ।
প্র প্র প্র প্র
মদন রায়ের বাকী দেখে তিন শোনে টাকা,
বাকী দেখে আগুন জলে নবাব আউলের গায়ে।
প্র প্র প্র প্র
মদন রায়চৌধুরী বাড়ি মোকাম রাজপুরে।
শন শুন নবাব শত্রেব শুন মোর বাণী।
মদন রায়ের বাসাবাড়ি উকিল আছে হুকুম হয়তো আনি
প্র প্র প্র প্র
ধাউড়ে বলিছে মেরা প্রপ্র ন মেরা রায় ।
জোর তলব হয়েছো তোরা হাজির ত্রশে হয়।
প্র প্র প্র প্র
রাজা মদন রায়ের
(নবাব সৈন্যরা রাজপুর গ্রামে মদন রায়ের প্রাসাদের অতি নিকটে এসেছে)
রাজপুর নিববাটী আছে এ পৌউছিল।
ফরিদ নস্কর মহেশ ঘোষ রহিলেন আর রাজা মদন রায়।
এখানে কালে কালে হাকে ডাকে ঘোড়া নাহি পায় ঘাট ।।
ধুলা ওড়াইয়া আসে রাস্তার মাটি।
বন্দ্রকে আগুন দিলে ধঞ্চে অন্দকার ।
হাতে ছিল বাজ - বৈরি করে তো শিকার ।
বন্দ্রকে আগুন দিলে ঘোড়ার চেচানি।
(মদন রায়ের প্রাসাদে)
সিংদরজায় হলো জেন কম্পিত মেদিনী ।।
আসিয়া মদন রায়েপ্রপ্র মারে হুড়ো।

ঘরহে থাকি বেরো বেটে চোত মদন রায় বুড়ো।
হুড়াহুড়ি গালাগালি দরজা পরে দেয় ।
ফরিদ নস্কর মহেশ ঘাষ দুইজনে এসে হাজির হয় ।
বাকি এত টাকা ত্রে (?) তোয়ে দারাকের উপরে (?) ।
জোড়া ২ মারে বেত পিঠের উপরে ।।
ফরিদ নস্কর কেঁদে বলে 'চলিয়াত' বা ২ ধরি ধরি তোমার পায় ।
মিনি অপরাধে আমাদের খুন করো নাই।
চালিয়াতগণ বলিচে বেটা পণ ফরমালি ।
জমিদার কাহাশে তেরা জলদি হাজির কর আনি ।
ফরিদ নস্কর বলিছে চলিয়াত বলি তোমার তরে।
জমিদার গিয়াছে মোদের দক্ষিণ হেথে গড়ে।
চালিয়াত বলিচেন বিটিচোত যুন ফরমান ।
তারায় করে পাঁচশ টাকা কোমর খশহি আন,
ফরিদ নস্কর বলে দুই জোনা বান্দিরি হিলেম তোমার কাছে ।

যুন ওরে কাবিলে আপন ভালাই জদি চায় ।
তরায় করে দরবারে তারে হাজির করে দেয় ।।
(মদন রায়ের প্রতি মন্ত্রী ফরিদ নস্করের উক্তি)
কি কারণে করো পূজন সেই আনন্দ মঠ ।
কেদো না কেদো না মহারাজ মন করো স্থির ।
তোমার ঘুটুরির জঙ্গলে এসেছেন মামারক পীর ।।
(মদন রায় বলেছেন)
নতুন নবাব এসেছে তার নাম সারিত্তে খাঁ ।
জমিদার বলে তোমার সঙ্গে মোরা যাব।
গাজী মিয়ার রাঙ্গাচরণ দেখিয়া আসিব।

(পীর মোবারক গাজীর উদ্দেশ্যে মদন রায়ের ঘুটিয়ারী শরীফে যাত্রা)
রাজপুর নিজ বাটি পশ্চাতো করি এ।
পেতক্ষীর মহারাজ উত্তরিলো গিএ।
মথুরা ভবানীপুর ছাড়াইয়ে জায়।
মেনে ঘটকপুর গেলেন রাজা মদান রায়
বেনে বউ শীষ-বেড়ে পশ্চাত করিএ।
কালিকে পুরে মহাশয় উত্তরিলো গিএ ।।
নবাশেনে যান রাজ নায় পার হএ,
গউদয় মহাসএ পউছিলে গাত্রী।।
গউদয় এ বাসাবাড়ি চৌপালা খেন থুএ (?)
পড়ি পেদ্যাদায় (?) চলেন সভে গলায় কাপড় দিএ।।
হাত কাটা খাল রাজা ঝাপে পার হলো।।
মকামে বসিএ গাজী জানিতে পাইল্য
(মদন রায়ের প্রতি মোবারকের উক্তি)
বলে রাখ মেটি না কেটে অরে মদন রায় চৌধুরী।
তিন পুরুষ তাগাদি বাবা তোমার জমিদার।।
দরবারেতে জাত্রা করো দিন বুদবার।।
মঙ্গলে উস্যু বুদুবারে দিবে পা ।।
(ঘুটিয়ারী থেকে মদন রায় রাজপুরে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসছেন)
বিদায় হএ মদন রায় করিল গমন।
হাত কাটার থালের কাচে দেলেন দরশন ।।
হাত কাটার খান চৌধুরী ঝাপে পার হএ।
কুমার ডে বেনে বৌয়।। পচাত করি এ মেনে ঘটকপুর
এলেন ডবায় ছাড়াইএ। ভবানীপুর মথুরাপর ভাবিএ
ছাড়াই । পেতাম্বরি এলেন আমার রাজা মহাশয়।

রাখ্যে কর রখ্যে করো। গাজী দয়াময় ।। চাকমন্দে খপর নএ
মধ্যে জায় (?) । পাস টাকা প্যেএচি মোরা চাকর মান্দের।
(মদন রায় ঢাকা থেকে ফিরে ঘুটিয়ারীতে মোবারকের কাছে যাচ্ছেন)
বিদায় করে মদন রায় আপনার লোকজন নিএ,
দেখিতে দেখিতে গঙ্গা এলো পার হএ।
এইরূপ রহে রহে মনজিল করি এ।
কালীঘাটে মদন রায় পৌছিয়া আসি এ।
কালীঘাটে পার হয়ে রাজা কুমড়ো খালি এলো।
কালীঘাটে কালিকপূজা দ্বি মোশ বলি।
প্রণাম হইএ চলে গড়ে পার হয়ে রাজা কুমড়ো খালি এলো।।
ফরিদ নস্করের তরে রাজা ডাকিয়া কহিলো।
দারির জাঙ্গাল ধরে জাই গাজির হুজুরে।
সাত খাসি সাত মন চাউল নে জেও তরায় করে ।।
বারসনর সত জমী পিরতোর গাজির নামে লেখে দিল।
মদন রায়কে খালাষ করেছিল পির মোবারক গাজী।
(এরপর এখানে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শব্দ প'ড়ে মনে হয় বলা হচ্ছে যে,
নবাব নিজের পাশে মদন রায়কে আদর করে বসিয়েছিলেন)
মহামায়া গড়িয়া জায় তুরিত ছাড়াই এ।
(মদন রায়ের প্রতি নবাবের উক্তি ও নবাব দরবারের দৃশ্য)
যুণ মদন রায় হে বলি তোমার তরে।
প্র প্র প্র প্র
তুমি হলে অন্যা দিবরে করিল।
বেসরি আজ্ঞা মেদনমল্যে পাট্টারি লিখিলো।
একঘটি তংকা নবাব পাট্টার সামেত নিল।
মদন রায় দস্তা (বা দস্তা) ধরে পাট্টা গুনে দিল।
প্র প্র প্র প্র

ঘুটুরি বসিএ গাজী জেনেছেন তক্ষণ।
প্র প্র প্র প্র
মহেশে ঘোষকে ডেকে রাজা কহেন এই বচন।
প্রজা আদি প্র প্র আমার করিও পালন।
দৌরাত্ত করো না তুমি বলি তোমার তরে।
দ্বর্ফ গেত্র (?) গাল না দেও আমারে।
(ঢাকার নবাবের কারাগরে বন্দীদের কথা ও অন্যান্য কাহিনী)
বার ভুমির জমিদারকে কখন কহিতে লাগিল।।
ফকির নস্কর বলিছে মহাশয় বলি তোমার কাছে।
তোমার মহেশ ঘোষ সিকিদির আছে কিনা আছে।
সিকিদির বাঁচাবে জদি মোর বানি।
তরায় করে পাঁচ সোয়া টাকা এনে দেয় তুমি।
মহেশ ঘোষ সকিদের হাতে বাদন তখন খাশাই এ দিলো।
(ঘুটিয়ারীতে মদন রায়েরে গাজীর উক্তি)
তিন পুরুষ তগাদি বাবা তোমার জমিদারি।
(বেলের জঙ্গলের দক্ষিণে ঘোলার কাছারীতে শিকদার মন্দিরায় এসেছেন। তাঁর উক্তি)
চন্যনসর জমিদারে বলো আছে কে।।
কাবীলে যুণ বলি রাজা সই।
চন্যশর জমিদারে আরো কেউ নাই।।
ঠগ ছিল দরবারে হেবে কি বলি কাবীলে
দুই ব্যেটা বাগ চন্যশার।
আছে এক ছেলে। রাজা বলে করি তালুক মল্যক
ছুনি যা মজারে।।
মিত্তে কথা কইনি বেটা আমার হুজুরে।
কাবিলে বলে বোঝানে না বোঝাই।
মামারা গাজী আল্লা রাজি চন্ন সার ব্যেটা

জমিদারী ছিল বাপে গাজীর হন।।
নেটা চন্নসর জমিদার ছিল।
কেলের বাজারে কিছু বাকী ছিল টাকা।।
হিসাবের দরবারে। চননস মরি যায়ে লো।।
গাজী হল একা। বেলে যা বাজারে
গাজী কেউ না সকা।।
চৌতারা কাছারী আসি মইদি রায় বসিল।।
ব্যেলে কাগচ জত দেখিতে লাগিল।।
দপ্তর খুলে বোরক ওলে নিগায় (?) করে চায় ।।
চন্নগর বাকী টাকা দেখিবারে পায় ।।
টিকা দিএ মইদি রায় করে লেখা জোকা।
বাকি হল এ সয় পঁচিশ টাকা।

পুঁথিটির উপজীব্য বিষয় হলো - ঢাকার নবাব-সরকারে রাজা মদন রায়ের তিন বৎসরের দেয় রাজস্ব বাকী পড়লে, রাজা নবাব সৈন্যদের দ্বারা রাজপুর গ্রামের নিজ বাটীতি ধৃত হন। তখন মন্ত্রীফরিদ নস্করের কাছে পরাজিত হয়ে পরিত্রাণের আশায় বর্তমান ক্যানিং থানার অন্তর্গত 'ঘুটিয়া শরিফ' নামক রেলওয়ে স্টেশনের কাছে বাঁশড়ার পীর মোবারক গাজীর কাছে যান এবং গাজী সাহেব রাজার আকুল প্রার্থনায় কৃপাবিষ্ট হয়ে রাজাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর রাজাকে ঢাকায় নবাব সকাশে যাবার পরামর্শ দিয়ে স্বয়ং একদিন উপস্থিত হয়ে নবাব শায়েস্তা খাঁকে রাজাকে ঋণ মুক্ত করার আদেশ দেন। রাজা কেবল ঋণ মুক্তি নয়, কিছু জমিদারীও লাভ করেন। রাজা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঘুটিয়ারীতে তাঁর জন্য বিরাট মস্‌জিদ নির্মাণ করে দেন (সে মস্‌জিদ অদ্যপি বর্তমান)। এই হলো ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার। রাজা মদন রায়ের ঘুটিয়ারী শরীফে বা ঢাকায় যাওয়া আসার পথের বর্ণনায় তৎকালীন কিছু রাজপথ ও গ্রামের নাম পাওয়া যায়, যাহা ইতিহাস রচনার কাজে লাগতে পারে। আর আছে পীর মোবারক গাজীর জীবনের কিছু পরিচয়। মোবারককে কখনো 'মামরজ' কখনো 'মামারক' নামে পুঁথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে রাজা মদন রায়ই এখানে মুখ্য পুরুষ। 'মদন পালা'

বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান দলীলরূপে গণ্য হবে বলে বিশাস করি।

পূর্ণাঙ্গ মদন পালার অলোচনার পর আমরা পুনরায় রায়মঙ্গল কাব্যের শেষ অংশে যেখানে পুষ্প দত্ত তাঁর পিতাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন সেই বিষয়ে আলোচনা করছি।

কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন যে বড়দহের ঘাটে নামিয়া পুষ্পদত্তেরে সঙ্গীগণ তোপধ্বনি করেন ও বাজনা বাজান। উহাতে মহা কোলাহলের সৃষ্টি হয় এবং রাজা মদন রায় তাহা শুনিয়া পরদল আসিয়াছে ভাবিয়া চিন্তিত হন। পরে চর পাঠাইয়া তিনি সমস্ত বিষয়ে সঠিক জানিতে পারেন। যথা ঃ-

কামানাতে দারুপুরি পাতিয়া সে সরাসরি
একেবারে দিলেন আগুণ।
গুরু গুরু উরু শব্দ লোক যত হয়ে স্তব্ধ
বাদজান শব্দ দ্বিগুণ ।।*

ঐ সময়ে পুষ্প দত্ত মদন রায়ের সভাতে আগমন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের বিবরণও উক্ত গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত আছে ....

রাজ সম্ভাষণে যায় লইয়া নানাধন।
লাইল ভেটোর দ্রব্য না যায় গণন।।
অনেক চাকর যায় লইয়া দ্বব্যজাতি।
দুদিকে ঘিরিয়া যায় পেয়াদা সংহতি।।
বসিয়াছে সভাকবি সেই নৃপবর।
সুরপুর মাঝে যেন দেবতা সুন্দর।।
নেকালে সদাগর আইল তথায়।
আইস আইস তাঁকে ডাকেন নররায়।।
বসিতে আসন দিল মেদিণী ভূষণ।
বসিল রাজার পাশে বন্দিয়া চরণ।।
রাজা বলে কহ পুষ্প দত্ত সদাগর।
এতদিন কোন কার্য্যে আছিলে সফর।।

শুনিয়া এইতো কথা সকল কহিল।
যেমনে দক্ষিণরায় উদ্ধার করিল।।
শনি বড় চমৎকার লাগিল সভায়।
প্রসাদ পাইয়া সাধু হইল বিদায় ।।

'রায় মঙ্গল' কাব্যে রাজা মদন রায় - এর উপর ঐতিহাসিক কালিদাস দত্ত যা বলেছেন, তাহা হল -

উপরোক্ত রায়মঙ্গল কাব্য ও মদনপালা নামক পুঁথি দুইখানি হইতে আরো জানা যায় যে রাজা মদন রায়ই দক্ষিণ ২৪ পরগণার গাজী সাহেবের ন্যায় দক্ষিণ রায়কেও প্রচার করেন। জনশ্রুতি, বারুইপুরের দক্ষিণে, ধপধপি গ্রামে দক্ষিণ রায়ের যে প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি পুজিত হইতেছে তাহাও রাজা মদন রায়ের দ্বারা স্থাপিত হয়। ধপধপিতে উক্ত দেবতার স্থানে তজ্জন্য প্রতি বৎসর গায়েনেরা দক্ষিণ রায়ের জাত উপলক্ষে পুর্ব্বোল্লিখিত মদনপালা গান করিয়া থাকেন।

পূর্বে উল্লেখ করেছি গাজী গানের কথা সেখানে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশযয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হুবহু তুলিয়া দিলাম।

মদন রায় ও মোবারক গাজীর পরিচয় জানিবার একান্ত কৌতুহল এর জন্য তৎকালে বারুইপুরের জমিদার আমার বৈবাহিক দুর্গাদাস রায় চৌধুরী মহাশয়কে মদন রায় ও মোবারক গাজীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারি, দক্ষিণ দেশে মুসলমান সমাজে 'গাজী সাহেবের গান' প্রচলিত আছে, তাহাতে রাজা মদন রায়ের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। গাজী সাহেবের গান শুনিবার আমার একান্ত ইচ্ছা হয়। তৎপূর্ব্বেই 'রায়মঙ্গল' গ্রন্থে দক্ষিণরায় ও বড়ে খাঁ গাজীর বিবরণ পাইয়া বিশ্বকোষ ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৎকালে স্বর্গগত বন্ধুবর ব্যোমকেশ মুস্তাফী রায়মঙ্গল বর্ণিত দক্ষিণরায় ও বড়ে খাঁ গাজীর ইতিহাস সংগ্রহের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল সাহিত্য - পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, মোবারক গাজীর সহিত বড়ে খাঁ'র কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মায়। দুর্গাদাস বাবু আমার অনুরোধে কলেমুদ্দি গায়েনকে ডাকাইয়া গাজী সাহেবের গানের কথা বলেন। জমিদারের আদেশে সীতাকুণ্ডু নিবাসী কলেমুদ্দি

গায়ন আমাকে একপ্রস্থ 'গাজী সাহেবের গান' বা মোবারক গাজী সাহেবের উপাখ্যান নকল করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা নিম্নে হুবহু তুলে দিলাম। আমার সংকল্প ছিল, আরও ২/১ প্রস্থ সংগ্রহ করিয়া, পাঠ মিলাইয়া পরে গাজী সাহেবের গান প্রকাশ করিব। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বহু চেষ্টাতেও আর এক প্রস্থ এত দিনেও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অবশ্য ২৪ পরগণায় প্রায় সকল বন বহুল মুসলমান - পল্লীতে গাজী সাহেবের আস্তানা আছে, বিশেষতঃ বারুইপুরের চৌধুরী জমিদারগণের যেখানে যেখানে জমিদারী আছে, সেখানে গাজী সাহেবের আস্তানা ও তাঁহার সম্মানার্থে হাজত দিবার ব্যবস্থা আছে। বিশেষ করে রাযচৌধুরী পরিবারে হাটবাজার যেখানে আছে, সেই সব বাজারে গাজী সাহেবের আস্তানা আছে।

হিন্দু মুসলমানের নিকট গাজী সাহেবের এরূপ অনন্য সাধারণ সম্মাণ লাভের কারণ কি, তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বহু চেষ্টাতেও আর এক প্রস্থ নকলের সুবিধা হইল না। এদিকে আমারও জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। দশ বর্ষের উপর গৃহ মধ্যে আবদ্ধ আছি, এমন কি, শয্যাগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থাতে সাহিত্য পরিষদের বর্তমান হিতৈষী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু আমার নিকট একটি প্রবন্ধের তলব করিলে, তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষার জন্য অদ্য আমার সংগৃহীত 'গাজী সাহেবের গান' নকল করাইয়া প্রকাশের জন্য পাঁঠাইলাম।

ঢাকার নবাবকে কর দিতে হইত। তখন মুর্শিদাবাদে নবাবের রাজধানী হয় নাই। খাজনা বাকী ফেলিলে ঢাকা হইতে নবাবী ফৌজ আসিয়া বাকিদার জমিদারগণকে ধরিয়া লইয়া যাইত। গাজী সাহেবের গানে লিখিত আছে -

নবাব বলে সেরেস্তাদার মেরা পানে চাও।
বাকি কেত্তা জমিদার বোলইয়া দাও ।।
কাগজ দেখে সেরেস্তাদার এই কথা বলে।
মদন রায় নামে রাজা দক্ষিণ মেদনমল্লে ।।
তিন সন খাজনা বাকি কাগজে তাহার।
শুনিয়া নবাব জ্বলে আগ বরাবর।।

তাঁহার কত টাকা বাকি পড়িয়াছিল, এ সম্বন্ধে পরে লিখিত আছে -
কাগজ দেখেন গাজী নিরখিয়া আঁখি।
তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা মদন রায়ের বাকি।।
নবাব তাঁহাকে ধরিবার জন্য) 'বার জন সেফাই চলে এক জমাদার।'

নবাবের এইরূপ কর্ম্মচারীগণ আসিয়া যথেষ্ট অত্যাচার করিত। অত্যাচারের ভয়ে তাহাদের সম্মুখে সহজে কেহ হাজির হইত না। গাজী সাহেবের গানে আছে

রাজপুর বাজারেতে আসিয়া পৌছিল।
দেখে যত প্রজা সবে ভয়যুক্ত হল ।।
কেহ বলে খুড়া জেঠা কেউ বলে ভাই ।
নবাবের সেফাই এল কোথায় পালাই ।।
কেহ বলে সিফাই কি ফকিরগণ এল ।।
মুসলমান ফকির সবে এইরূপে বেড়ায়।
এসেছে ছয়লাপে বুঝিনু নিশ্চয় ।।
কেহ বলে ফকির যদি ইহারা হইবে ।
পঞ্চ হাতিয়ারা কেন সঙ্গেতে থাকিবে।।
যুদ্ধের সাজে সেজে এল বুঝিনু নিশ্চয় ।
ফকির কখনও নয় সিফাই নিশ্চয়।।
চল সবে দেখা করি তাহাদের সাথে ।
সিফাই হইলে কিন্তু মোট দিবে সাথে ।।
পেয়াদার বোঝা বয়ে যাইতে হইবে ।।*

এদিকে সেফাইগণ আসিয়া পড়িল; প্রজাগণ আর যায় কোথা? জমাদার তাহাদিগকে মদন রায়ের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। ভয়ে ভয়ে তাহারা মদন রায়ের বাড়ী দেখাইয়া দিল। এ দিকে প্রজাগণ তাড়াতাড়ি আসিয়া মদন রায়কে সংবাদ দিল, নবাবের ফৌজ তাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছে। সে সংবাদ পাইয়া রাজা মদন রায় থরথর কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন ফরিদ নস্কর।

/মন্ত্রী বলে মহারাজ ভয় না করিবে।
কাছারী হইতে উঠে লুকাইতে হবে।।

মদন রায় বলেন আমার ভাগ্যে এই ছিল।
মেদনমল্লের রাজা হয়ে পালাইতে হল ।।*

এখন রাজা মদন রায় আর করেন কি? অন্তঃপুরে গিয়া তিনি পালাইয়া রহিলেন। এ দিকে সিফাই আসিয়া সদর-দরজায় পৌঁছিল, দরজাতে লাঠি সোটা মারিতে লাগিল। ভাব গতিক দেখিয়া রাজার প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহার দেওয়ানজী মহেশ ঘোষকে সিফাইদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দরজায় আসিয়া, -

মহেশ ঘোষ বলে আমি দেওয়ান রাজার।
এ কথা শুনিয়া রাগে কহে জমাদার ।।
মহারাজ কাহা তেরা দেহ পরিচয়।
পালাইয়া গেছে কিম্বা লুকাইয়া রয় ।।
জোড় হস্ত করি তখন মহেশ ঘোষ বলে।
তিন দিবস গিয়াছেন দক্ষিণ পেঁচাকুলে ।।
সেখানেতে তালুক আছে তোমরা জান না।
তিন দিনের পথ সেই পেঁচাকুল পরগণা ।।

জমাদার মহেশ ঘোষের কথা বিশ্বাস করিল না, মহেশ ঘোষের অনেক কাকুতি মিনতি শুনিল না। শেষে মহেশ ঘোষকে চাঁপাগাছে লটকাইয়া বেত মারিতে হুকুম দিল। বেত খাইয়া ঘোষ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মদন রায় দোতলার উপরে বসিয়া তাহা দেখিলেন, তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন, -

/মন্ত্রী বলে মহারাজ না করিও ভয়।
কিছু টাকা খরচ করিলে বড় ভাল হয় ।।
আসামীর কাছে যদি ওরা টাকা কিছু পায় ।
যুক্তি পরামর্শ কত বলে কয়ে দেয় ।।*

মন্ত্রী ২৮ টাকা লইয়া, মোবারক গাজীর নাম স্মরণ করিয়া জমাদারের নিকট হাজির হইলেন। জমাদার মন্ত্রীকে দেখিয়াও অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিল। প্রত্যেকে টাকা পাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তখন জমাদারকে মন্ত্রী বলিলেন, মদন রায় তিন দিন পরে পেঁচাকুল হইতে ফিরিয়া আসিবেন। জমাদার সন্তুষ্ট হইয়া দশ দিন সময় দিল। মন্ত্রী মহেশ ঘোষকে আনিয়া রাজা মদন রায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, -

/আদা ছেঁচে আদার জল মুখে দিতে যায়।
বাবাজী বাবাজী বলে ডাকে উভরায় ।।
দেওয়ানজী অজ্ঞান হয়ে আছে মার খেয়ে।
আদা ছেঁচা দিও বাবা তব নাম লয়ে ।।
সেলাম করেন মন্ত্রী গাজীর চরণে।
আদার জল দিতে গেল দেওয়ানজীর বদনে ।।
অন্তর্যামী মোবারক অন্তরে জানিল।
গাজীর দয়ায় তাহার চৈতন্য হইল ।।
উঠিয়া দাঁড়ায় তখন রাজার সম্মুখে।
অবাক্ হইল রাজা দেওয়ানজীকে দেখে ।।*

রাজা ত অবাক। মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন, একমাত্র গাজী সাহেবের কৃপায় মহেশ ঘোষ প্রাণ পাইয়াছে। মদন রায় মোবারক গাজীর এই পরিচয় পাইলেন। মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার এই দারুন বিপদের সময় গাজী সাহেব ভিন্ন আর উপায় নাই। তখনই মন্ত্রীর পরামর্শে সির্ণির জোগাড় হইল। সেই সির্ণির হাড়ী লইয়া রাজা মদন রায় প্রভাতে উঠিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া পালকীতে চড়িয়া গাজী সাহেবের দর্শনে চলিলেন, -

/রাজপুর নিজবাটী পশ্চাৎ করিয়া।
সোনারপুর গ্রামে রাজা উত্তরিল গিয়া ।।
সোনারপুর থেকে রাজা হলেন বিদায়।
নওয়াভাসানের ঘাটে এসে উপনীত হয় ।
নওয়াভাসানের ঘাটে রাজা পার হইয়াছিল ।
গৌড়দহ কাছারি পাছে উপনীত হল ।।*

এখানে আসিয়া রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কত দুর যাইতে হইবে? দুর হইতে মন্ত্রী রাজাকে নিশান দেখাইয়া কহিলেন, বনমধ্যে ঐ যে নিশান দেখা

যাইতেছে, ঐখানে গাজী সাহেবের মোকাম। রাজা কহিলেন, এই বনের মধ্যে বাঘ আছে, কিরূপে ইহার মধ্যে যাইব? মন্ত্রী কহিলেন, কোন চিন্তা নাই, বাবাজীর দোহাই দিলে বাঘ দূরে পালাইয়া যায়। পাল্কী চড়িয়া গেলে তাঁহার সহিত দেখা হইবে না। পাল্কী হইতে সির্ণির হাড়ী আপনাকে মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এ দিকে ভক্তকে ছলনা করিবার জন্য গাজী সাহেব পঞ্চম বৎসরের বালক হইয়া রহিলেন। রাজার বিশ্বাস হইল না যে, তিনি গাজী সাহেব। রাজা গাজী সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, -

/কাঙ্গালেরা এই ছেলে ফেলিয়া গিয়াছে।
সির্ণি খাবার লোভে এই ছেলে বসে আছে ।*

মন্ত্রী বুঝাইয়া বলিলেন, ইনিই গাজী সাহেব, ইহার চরণ বন্দনা করুন। তখন রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গাজীর চরণ ধরিলেন, গাজী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাথায় পদধূলি দিলেন। মদন রায়ের প্রতি অনুমতি হইল, /আমার পুকুরে গিয়া খানিকটা মাটি কাট।* গাজীর আদেশে মদন রায় কোঁড়াদারের নিকট হইতে কোদাল লইয়া মাটি কাটিবার জন্য পুকুরে নামিলেন, তিন কোপের সময় তাঁহার কাপড় খুলিয়া গেল। তখন, -

/কোদাল রেখে মদন রায় কাপড় পড়্ তেছিল।
মদন রায়কে ডেকে গাজী কহিতে লাগিল ।।
তিন কোপ মাটি কাট্‌লে রাজা মদন রায়।
তিন পুরুষ জমিদারী রহিবে নিশ্চয় ।।*

গাজীর মুখে এই কথা শুনিয়া মদন রায় অবাক হইলেন। তিনি পায়ে ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। তখন গাজী সাহেব বলিলেন, আমার বাক্য অন্যথা হইবার নয়। তবে -

/পোষ্য পুত্র রাখিলে তোমার তালুক রক্ষা হবে।
যত দিন নাম মম রবে মেদনমল্লে ।
ততদিন জমিদারী রহিবে নিশ্চয়।
তত দিন দুঃখ নাহি পাবে কোন কালে ।।

তবে তেরদ্দর্শ পুরুষ পরে বংশ লোপ পাবে।
তখন পোষ্য পুত্র রখিলেও বংশ লোপ হইবেই ।।*

তখন গাজী বলিয়া দিলেন, তোমার আর ভয় নাই। তুমি যাইবামাত্র দরজাতে সকলে তোমাকে সেলাম করিবে, তোমার সঙ্গে চাকররূপে ঢাকা যাইবে, তোমার মকদ্দমা ফতে হইবে। মঙ্গলবারে যাত্রা করিবে এবং শুক্রবারে তোমার উদ্ধার হইবে। গাজী সাহেবের নাম যতদিন থাকিবে ততদিন মঙ্গল ও শুক্রবার যে কাজ করিবে তাহা সাফল্য হইবেই হইবে। তখন মদন রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, -

/মোকদ্দমা করে দেন বড় করেন হিত।
মসজিদ্ মোকামে দিব সোনা রূপার চিত ।।
সাত খানস দিয়া তব নামে হাজত দিব।
গান বাইন ডেকে তব গান করাইব ।।
মোবারক বলে বাবা আমার বাক্য লবে।
তোমা হইতে নাম মম জাহির হইবে ।।
মুর্শিদের নামে সির্ণি হাজত করিয়া।
মদন রায়ের হস্তে দিল প্রসাদি বলিয়া ।।
সির্ণির হাড়ী মদন রায় মাথায় লইল।
সেলাম করিয়া তবে বিদায় হইল ।।
ঘুটারী সেরিফ হইতে হলেন, বিদায়।
গৌড়দহ কাছারিতে উপনীত হয় ।।
গাজীর স্মরণ রাজা মনেতে করিয়া ।
বিদায় হইলেন রাজা পাল্কীতে বসিয়া ।।
বেহারা লইয়া পাল্কী দ্রুত বেগে যায়।
নিমতলার ঘাটে এসে উপনীত হয় ।।
নিমতলার ঘাট রাজা পার হয়ে ছিলন ।
পুঁড়ী বেগমপুর রাজা মদন রায় এল ।।
পুঁড়ী বেগমপুর হতে রাজা হলেন বিদায় ।

রাজপুর নিজ বাড়ী উপনীত হয় ।।*

মদন রায়কে পাল্কীতে চড়িয়া আসিতে দেখিয়া প্রথমে পেয়াদাগণকে ডাকিয়া একটু হাঁকাহাঁকি করিয়াছিল, কিন্তু মদন রায় গাজীকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি সোনার ভ্রমর হয়ে রাজার হস্তে বসিলেন এবং গুন্ গুন্ স্বরে অভয়বাণী দিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা মদন রায় অন্তঃপুরে পাল্কী চড়িয়া চলিলেন। এ দিকে বার জন সিফাই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। জমাদার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া কোন উত্তর পাইল না।

/জমাদার ডাকে তারা উত্তর নাহি দিল।
দেখে মন্ত্রী ফরিদ নস্কর রাজার কাছে গেল ।।*

যাহা হউক, বাবাজীকে স্মরণ করিবামাত্র ১২ জন সিফাইয়ের জ্ঞানোদয় হইল। রাজা ঢাকায় যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমে পাল্কী চড়িয়া নাগরা ও নিশান লইয়া বহু লোক সঙ্গে চলিল। যে পথে মদন রায় ঢাকায় গিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ বর্ণিত আছে, -

রাজপুর নিজবাটী পশ্চাৎ করিল।
সোনারপুর গ্রাম রাজা গিয়া উত্তরিল ।।
সোনারপুর থেকে রাজা হলেন বিদায়।
টালিগঞ্জ গিয়া তখন উপনীত হয়।
প্র প্র প্র প্র
টালিগঞ্জে মহারাজ তাঁবু ফেলে রয়।
সেই রাত প্রভাত হল বড়ই সকালে ।।
প্র প্র প্র প্র
পাল্কী চড়ে মহারাজ করিল গমন।
গাজী সাহেবের নাম করিয়া স্মরণ ।।
টালিগঞ্জ হতে রাজা হইলেন বিদায়।
কালীঘাটে গিয়া তখন উপনীত হয় ।।
কালীঘাট মহামায়া বামেতে রাখিয়া।

কলিকাতা মহারাজ পৌছিল যাইয়া ।।
কলিকাতা মহারাজ পশ্চাৎ করিল।
বরানগর চিৎপুর উপনীত হল ।।
বরানগর চিৎপুর পার হয়ে যায়।
ফরাসডাঙ্গাতে গিয়া উপনীত হয়।।
ফরাসডাঙ্গা মহারাজ পশ্চাৎ করিল।
আনওয়ারপুরে গিয়া তখন উপনীত হল ।।
এইরূপে তিন মাস পথে চলে যায়।
ঢাকার সহরে গিয়া উপনীত হয় ।।*

ঢাকায় আসিয়া মদন রায় ছয় দণ্ডের পথে তাঁবু ফেলিয়া রহিলেন এবং মনে মনে গাজীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে গাজীর আসন টলিল। তিনি রাত্রিকালে ঢাকার সহরে স্বপ্নে নবাবকে দেখা দিলেন ও তাঁহাকে কহিলেন, -

/উঠ উঠ নবাব আউলে হও রে চিতন।
শিহরে মোবারক গাজী ঘুমে এত মন।।
আল্লা মোরে করিয়াছেন জাহিরের পীর।
মায়াজালে রহিলাম বন্দী না হইল জাহির ।।
আমার নাম মোবারক গাজী নেও রে পরিচয়।
কাল প্রভাতে আসবে হেতা রাজা মদন রায় ।।
শাল শিরোপা পাল্কী দিয়া তারে উলাইবে।
চড়নের ঘোড়া তোমায় বক্‌সিস্ করিবে ।।
আর এক বাত নবাব শুন হক্কিত।
পরোয়ানা লিখিয়া দিবে বেসরিকত ।।
খেতাবী করিবে বিদায় মদন রায়ের করে ।
আমার মোকাম হবে ঘুটারী মাঝারে ।।*

নবাব গাজী সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করিতে সম্মত হইলেন। ইহার পর গাজী নবাবের দপ্তরখানায় গিয়া প্রবেশ করিলেন, -

/কাগজ দেখেন গাজী নিরখিয়া আঁখি।
তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা মদন রায়ের বাকি ।।*
/ডাইনের বাকি লয়ে বামে ফেলে দেয় ।
কাগজ সারিয়া গাজী হলেন বিদায় ।।*

পরদিন নবাব শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। ফজরের নমাজের পর উজীর নাজীর প্রভৃতি আসিয়া নবাবের সঙ্গে দেখা করিলেন। নবাব তাঁহাদিগকে স্বপ্নের কথা জানাইলেন। তাঁহাদের পরামর্শে মদন রায়কে আগ বাড়াইয়া আনিবার জন্য হাতিয়ার লইয়া পঞ্চাশ জন সিফাই চলিল। প্রথমেই সিফাই দেখিয়া মদন রায় বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন। তৎপরে যখন বুঝিলেন, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইবার জন্য তাহারা আসিয়াছে, তখন মহাসমারোহে মদন রায় পাল্কীতে চড়িয়া নবাব-দরবারে আসিলেন। নবাব মদন রায়কে নিজের ডাইন দিকে বসাইয়া সম্মানিত করিলেন, পরে নিজের হাতে নবাব বেসরিকতের পাট্টা সহি করিয়া দিলেন। এ সময়ে কয়েক জন ভূঞা জমিদার ঢাকার কারাগারে বন্দী ছিলেন। মদন রায় যখন কার্য্যোদ্ধার করিয়া ফিরিতেছিলেন, সেই সময় জেলখানার নিকটে কয়েদী আসামীগণকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা দারোগাকে হাজার টাকা ঘুষ কবুল করিয়া মদন রায়ের সহিত দেখা করিলেন। তাঁহাদের অনুনয় বিনয়ে ও মন্ত্রীর পরামর্শে মদন রায় আবার ফিরিয়া নবাবের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তখন নবাব তেল মাখিতেছিলেন। দূর হইতে মদন রায়ের পাল্কী দেখিয়া তাঁহার ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে মদন রায় জানাইলেন, -

/ভাবিত হইয়া কহে রাজা মদন রায়।
বার ভূঞে জমিদার ধরেছে আমায় ।
নবাব আউলে ডেকে বলে শুন বাবাজী।
কয়েদে আসামীর উপায় তুমি করবে কি ।।
মদন রায় বলে আমি ধর্ম্ম প্রমাণ কর।
বার ভূঞে জমিদারের জামিন হয়ে রব ।।*

তখন নবাব আদেশ করিলেন যে, তুমি জেলখানায় গিয়া কয়েদী আসামীদের হাতের বেড়ী স্বহস্তে কাটিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার কর। তখন মদন রায় জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। এ দিকে -

/মোবারক বলে দুখি শুন বাবাজী।
অদৃষ্টে লিখন তাহার আমি করব কি ।
ভাগ্যে তাহার লেখা আছে জেলে যেতে হবে।
আড়াই ঘন্টা মদন রায় জেলখানাতে রবে ।।
মোবারক গাজীর কথা রদ নাহি হল ।
বেড়ী কাট্‌তে মদন রায়ের আড়াই ঘন্টা গেল।।
একে একে বাহির করে যত জমিদারে।
শেষকালে মদনরায় আইল বাহিরে ।।
জমিদারে হাজতের টাকা চাঁদা তুলে দেয়।
এক হাজার টাকা তখন হাজতের হয়।
গাজীর স্মরণ করে যে যার বাটীতে যায়।
পাল্কী চড়ে হলেন বিদায় রাজা মদন রায় ।।
ঢাকা হইতে রাজমিস্ত্রী সঙ্গে করে নিল।
গাজীর স্মরণ করে পথেতে চলিল ।।
একাক্রমে দুই সপ্তা একা পথে চলে।
কলিকাতা এসে রাজা এই কথা বলে ।।*

বলিতে কি, মদন রায় গাজীর কৃপায় তিন মাসের পথ দুই সপ্তাহে আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া রাজা এক হাজার টাকার মিঠাই কিনিয়া লইয়া গাজী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। মোবারক গাজী মদনরায়কে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। মদন রায় মস্‌জিদের স্থান দেখিতে চাহিলেন এবং মস্‌জিদের স্থান দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ঢাকা থেকে সঙ্গে করে রাজমিস্ত্রি নিয়ে এসেছিলেন, মোবারক গাজীর দেখানো স্থানে রাজমিস্ত্রিদের দিয়ে মস্‌জিদ নির্মাণ করতে শুরু করেন। মদন রায়ের উৎকৃষ্ট সাতটা খাসী লইয়া গাজী সাত হাঁড়ী মাংস সাতটি

উনুনে বসাইলেন ও মুর্শিদের নামে হাজত করিয়াছিলেন। পরে সকলকে সির্ণি দিয়া মদন রায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে মদন রায়ের দ্বারা গাজীর নাম সর্বত্র জাহির হইয়াছিল।

গাজী সাহেবর গানের যে নকল পাইয়াছি, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে মনে হইবে, ঢাকার নবাবী আমলে মোবারক গাজী ও রাজা মদন রায়ের অভ্যুদয়। ১৭শ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে নবাব নাজিমের রাজধানী পত্তন হয়। সুতরাং তৎপূর্ব্বে গাজী সাহেবের নাম জাহির হইয়াছিল। রাজা মদন রায়ের অষ্টম পুরুষ অধস্তন স্বর্গীয় দেবেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের মুখে জানিয়াছি, ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে রাজা মদন রায় ঢাকায় গিয়াছিলেন। তৎকালে নবাবের কর্ম্মচারীগণ সাধারণের উপর কিরূপ অত্যাচার করিত, জমিদারেরাও কিরূপ খাজনা বাকি ফেলিতেন, মুসলমান ফকিরগণের হিন্দু মুসলমান সকলের উপর কিরূপ প্রভুত্ব ছিল, হিন্দু বড়লোকও মুসলমান পীর ও গাজীকে কিরূপ সম্মান করিতেন, মোবারক গাজীর কিরূপ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, তাহা এই গাজী সাহেবের গানে বর্ণিত হইয়াছে। এই গানের ভাষায় গায়েন ও নকলকারীর দোষে আধুনিক ছাপ পড়িলেও ইহার মধ্যে ইংরেজ প্রভাবের কোন নিদর্শন নাই। মুসলমানের রচনা ও মুসলমান গায়েনেরা এই গান সর্বত্র সুরলয় যোগে গাহিলেও ইহাতে সেরূপ মুসলমানী উর্দ্দু ভাষার ছাপ পড়ে নাই। গোছল, সিরণী, হাজত, মুর্শিদ, হকিকত, বেসরিকৎ, আউলে, তলব এরূপ সামান্য কয়েকটি শব্দ ভিন্ন সর্ব্বত্রই ২৪ পরগণার খাঁটি বাঙ্গালা। এরূপ গান বঙ্গের নানা স্থানে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে নানা হীন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, সেই সকল সংগৃহীত হওয়া অবশ্যক। এই সকল গ্রাম্য-গীতি হইতেও বিভিন্ন সমাজের রীতি নীতি, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাসের ক্ষীণ স্মৃতি বাহির হইতে পারিবে, তাই এই সকল সংগৃহীত হওয়া অবশ্যক।

বহু চেষ্টা করে আব্দুল কলমদ্দিন সাহেবের কাছে পীর মোবারক গাজীর পাঁচালী ও গীত ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ৬ (ছয়) জন ব্যক্তি পরপর লেখে। বর্তমান মদন পাঁচালিটি তুলে দিলাম। বাবা পীর মোবারক গাজীর পাঁচালী ও গীত ঃ-

(১) প্রথম রচনা ও লেখকের নাম - আব্দুল কলমদ্দিন, সাং - সীতাকুণ্ড, থানা - বারুইপুর, ডাক - সীতাকুণ্ডু, জেলা - ২৪ পরগণা (২) উপেরোক্ত লেখকের শিষ্য - ঁনিতাই ছাটুই, সাং - সীতাকুণ্ডু থানা - বারুইপুর, ডাক - সীতাকুণ্ডু, জেলা - ২৪ পরগণা (৩) দ্বিতীয় লেখকের শিষ্য - কুশাইচন্দ্র মণ্ডল, সাং - রামনগর, থানা - বারুইপুর, ডাক - রামনগর, জেলা - ২৪ পরগণা (৪) তৃতীয় লেখকের শিষ্য - ঁপশুপতি সরদার, সাং - রামনগর সরদার পাড়া, থানা - বারুইপুর, ডাক - রামনগর, জেলা - ২৪ পরগণা (৫) চতুর্থ লেখকের শিষ্য - ঁতারাপদ নস্কর, সাং - রামনগর সরদার পাড়া, থানা - বারুইপুর, ডাক - রামনগর, জেলা - ২৪ পরগণা (৬) পঞ্চম লেখকের শিষ্য - জ্যোতিষচন্দ্র কয়াল, সাং - শাঁখারী পুকুর, থানা - বারুইপুর, ডাক - পিয়ালী টাউন, জেলা - ২৪ পরগণা।

-ঃ আরম্ভ ঃ-

বন্দনা -

মমিন আল্লাবল মবি দ্বিবামবর দিন (ত) বয়ে গেল (রে) দিন (ত) বয়ে গেলরে মমিন, সময় বয়ে গেল (রে)

ঃ পাঁচালি আরম্ভ ঃ

একদিন বেলদারকে ডেকে গাজী মক্কা তৈয়ারী করে। নবাব আসি বসিলেন ঢাকার সহরে।। নবাব বলে ফেরেস্তাগণ মেরা পানে চাও । বাকির খাতাগুলি আমার কাছে শীঘ্র করে আনিয়া দাও।। তখন ফেরাস্তাগণ বাকির খাতাগুলি নবাবের হাতে তুলে দিয়েছিল। নবাব সাহেব বাকির খাতাগুলি হাতে করে নিয়েছিল।। বাকির খাতা হাতে করে নিয়ে নবাব তখন নিরখিল আঁখি। খাতা দেখে নির্ণয় করে ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে বারুইপুর থানার অন্তর্গত মদন রায়চৌধুরীর তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকা বাকি।। (ধুয়া)

খাতা ফেলে নবাব জুলে আগুন সমান। বারজন সিফাই এক জমাদার তাকে পাকড়িয়া আন (গো) ত্তরে ও তার মায়া, মায়া বোঝা গেল রে - ত্তরে ও তার মায়া - বারো জন সিফাই সাজে এক জমাদার। তলপে চলিলেন সেই মদন রাজার। ঢাকার সহর তারা পশ্চাৎ করিল। এদিকে ঘুঁটিয়ারী সরীফে পীর মোবারক

গাজী মোকামে বসিয়া অন্তরে জানিতে পারিল ।। তখন বাবাজির সেবক ছেলে দুখিকে ডেকে কহিতে লাগিল।। (তখন) বাবজি বলছেন, দেখ বাপ দুখি আমাদের আর মেদনমল্ল পরগণা বাস করতে হবে না। (দুখি বলছে) কেন বাবাজি? (তখন বাবাজি বলছেন) দেখ বাপ দুখি - আমরা যে জমিদারের তালুকে বাস করি - ঢাকার সহরে, নবাব সায়েস্তাহান খাঁ তাঁহার আদেশে সিফাইগণ আসছে মদন রায়চৌধুরী আমাদের যে জমিদার তাহাকে বেঁধে নিয়ে যাবে, তাহা হলে আমাদের উপায় হবে কি? ওরকম জমিদার কোন জায়গায় দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমরা যে জায়গায় বসে আছি, এই জায়গার খাজনার টাকা পয়সা দিতে হয় না। নিস্কর বসে দখল করে খাচ্ছি। (তখন বাবাজি বলছেন) দেখ বাপ দুখি, এর উপায় আমি করতে পারি, ঐ যে মদন রায় যদি আমার কাছে আসে, তাহা হলে ওকে উদ্ধার করে দিতে পারি। (তখন দুখি বলছে) বাবাজি? ও অহঙ্কার আপনার অনেকদিন আগে ভেঙে গেছে, তা না হলে দক্ষিণ মন্দির রায় আপনার পায়ে বেড়ি দিত না। (বাবাজি তখন বলছেন) (ধুয়া)

শুনরে বাপ ওরে দুখি, আজ আমার মাথা খেলি।। বহুদিনের পুরানো কথা আমার মনে করে দিলি রে, ওরে ও তার মায়া, মায়া বোঝা ভার গো। (ওরে ও তার মায়া) তখন বাবাজি বলছেন - দেখ বাবা দুখি, বেলোর রাজ্যের মান্দির রায়, কিন্তু আমার পায়ে বেড়ি দিয়ে সে কত সুখে আছে, আমার অভিশাপে স্বঃ বংশ নির্ব্বংশ হয়েছে। দেখ বাবা দুখি, ওসব কথা থাক, বাবাজি এবং দুখি এই সমস্ত কথা কহিতেছিল। এদিকে নবাব সাহেবের সিফাইগণ কালীঘাটে আসি উপনিত হলো। কালীঘাটে এসে কালী মাকে ডেকে কহিতে লাগিল । (ধুয়া) কালীঘাটের কালিমায়ী গো (তুমি) জাগ্রত জননী। অন্তিমকালে পাই যেন মাগো তোমার চরণ দুখানি গো। ওরে ও তার মায়া, মায়া বোঝা ভার গো, ওরে তার মায়া। তখন সিফাইগণ কালী মায়ের নিকট বলছে। (মাগো) যাবার মাত্র মদন রায়কে পাবো, ফিরে যাবার সময় তোমার পদে পুষ্পানজ্জলি দিয়া যাবো, ঐ কথা বলে সিফাইগণহলেন বিদায়। সন্ধান করতে করতে মদন রায়চৌধুরীর দ্বারে গিয়ে উপনীত হয়। মদন রায় মদন রায় বলে ডাকিতে লাগিল, মদন রায় বাটীর মধ্যে ছিল, শুনিতে পেয়েছিল। (তখন) মদন রায়চৌধুরীর এক মন্ত্রী, তাহার নাম

ফরিদ নস্কর - মদন রায় মন্ত্রীকে ডেকে বলছেন, দেখ মন্ত্রী এখন আমার উপায় কি? এখন কি করিলাম দেখি, (মন্ত্রী তখন বলছে) মহারাজ আপনি এখন একটা কাজ করুন। আপনি এই স্থান হইতে অন্য স্থানে পালিয়ে যান। (তখন মদন রায় বলছেন) দেখ মন্ত্রী আমি যদি এই স্থান হতে পালিয়ে যাই, তাহা হলে আমার মানৎ রবে কেন? (তখন মন্ত্রী বলছেন) মহারাজ, নবাব সাহেবের সিফাইগণ এসে আপনার পায়ে যখন বেড়ি দিবে, তখন বলুন দেখি আপনার মানৎ কোথা রবে। (তখন মদন রায় বলছেন) দেখ মন্ত্রী এখন আমার উপায় কি হবে। (তখন মন্ত্রী বলছেন) মহারাজ এর একটা উপায় আছে, আপনার যে দেওয়ান মহেশ ঘোষ আছে, ওকে বলুন ঐ যে বারোজন সিফাই এসেছে, উহাদের জন্য বারোখানা আশন নিয়ে বসিবার জায়গা দিয়ে আসতে। বলুন, তারপর এর উপায় আমি করছি। তখন মদন রায় মহেশ ঘোষকে ডেকে বলছেন - দেখ মহেশ ঘোষ, ঐ যে বারোজন সিফাই এসেছে, উহাদের বসিবার জায়গা দিয়ে এসো। মহেশ ঘোষ ঐ কথা শুনে বারোখানা আশন নিয়ে সেই সিফাইগণের নিকটে গিয়া উপনীত হয়, তখন সিফাইগণ মহেশ ঘোষকে ডেকে এই কথা কয়, এ তোম কোন আদমি হায়, (মহেশ ঘোষ বলছেন) হাম মহেশ ঘোষ শিকদার হায়। (সিফাইগণ বলছে) এতো ঠিক আদমি হায়, এ তোমকো জমিদার কাঁহা গিয়া, (মহেশ ঘোষ বলছেন) হামকো জমিদার দক্ষিণ পেঁচাকুল তালুকমে যাতা হায়। (সিফাইগণ বলছে) এ তোমকো জমিদারকা জালতি জালতি হাজির করকে দেতা হায়, (মহেশ ঘোষ বলছেন) এ তোম এখানে বৈঠা রহ তোমকো সামনে একটা মৃত্তিকা জমিদারকা গঠকে দিয়া হায়। (তখন সিফাইগণ বলছে) ঠাট্টা কিয়াও রে হারামজাত। ঐ কথা বলে সিফাইগণ মদন রায়কে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য যে রসি এনেছিল সেই রসি দিয়ে মহেশ ঘোষকে দুইটি হস্ত বন্ধন করে সামনে ছিল একটি চাঁপা ফুলের গাছ, সেই গাছে মহেশ ঘোষকে টাঙ্গাইয়া বেঁতের উপর বেঁত তখন মারিতে লাগিল, মহশে ঘোষ প্রাণ যায় প্রাণ যায় বলে মহারাজকে ডেকে কাঁদিতে লাগিল—

মহশে ঘোষের গীত ঃ

এ সময়ে কোথা রহিলে মহারাজ এখন,
বেত্রাঘাতে প্রাণ নাসে দুর্জ্জয় সিফাইগণ।।

(আমার) বেত্রাঘাতে প্রাণ নাসে, কোথায় মাহারাজ এখন,
নিজ দাসের কর রক্ষা নইলে বুঝি যায় জীবন।।

তখন মদন রায়, মহেশ ঘোষের কান্না, বাঠীর মধ্যে হতে শুনতে পেয়েছিলেন, তখন মন্ত্রীকে ডেকে মদন রায় কহিতে লাগিল, শুন মন্ত্রী ঐ শুন মারের জ্বালায় মহেশ ঘোষ এবার আমার নাম বলে দিবে। (তখন মন্ত্রী বলছে) দেখুন মহারাজ ঐ মহেশে ঘোষ ঠিক যদি নিমুকের চাকর হয় তাহলে প্রাণ গেলেও আপনার নাম বলে দেবে না। (মদন রায় বলছেন) দেখ মন্ত্রী এখন কি করি বল দেখি, (মন্ত্রী ফরিদ নস্কর বলছেন) মহারাজ এর উপায় আমি করছি। এই কথা বলে, ফরিদ নস্কর তখন কি করিলেন - সেই ঘুটীয়ারী সরিফে যে বাবাজি আছেন, পীর মোবারক গাজী, তাহার নাম স্মরণ করেন। তাহার নাম ভক্তিভাবে হৃদয়ে স্মরণ করে বলছেন, বাবাজি গো, আমি এই সিফাইদিগের কাছে যাব, ওরা যেন আমার কাছে কোন কড়া কথা বা জোর কথা না বলতে পারে। ঐ কথা বলে মন্ত্রী ফরিদ নস্কর হলেন বিদায়। সেই সিফাইদিগের কাছে গিয়া এই কথা কয়। এ তোমহ্রা কোন কোন আদমী কিয়া নাম হায়। (সিফাইগণ বলছে) হামহ্রা বারোজন সিফাই হায়, হিঁয়াসে বুড্ঢা আদমী জমাদার হায়। (মন্ত্রী বলছে) তোমরা বারোজন বারো শিক্কা লও। আর বুড্ঢা আদমী দুই শিক্কা লও এবং আলু লও ঘি লও চাল লও ডাল লও - রসি পাকড়াকা খাতা হ্যা সাত রোজ মে হাঁমার জমিদারমে হাজির করকে দিতা হায় (সিফাইগণ বলছে) আরে মাসকা বাদ মে তোমকা জমিদারকা হাজির করকে দেতা হায়। ঐ কথা বলে মন্ত্রী ফরিদ নস্কর চাঁপা ফুলেরে গাছের দিকে লক্ষ করে দেখে যে, মহেশ ঘোষকে হাতে দড়ি বেঁধে চাঁপা ফুলের ডালে বাঁধা আছে এবং মহেশ ঘোষ অজ্ঞান হয়ে আছে, তখন ফরিদ নস্কর ছুটে গিয়ে মহশে ঘোষের হাতের বাঁধন খুলে দেয়, (তখন সিফাইগণ বলছে) এ, ও আদমী মর গিয়া নরদমা মে ফিঁক দিতা হ্য, (মন্ত্রী বলছে) না ভাই সকল ও মরে নাই আমি ওকে অন্তপুর মধ্যে নিয়ে যাব। এই কথা বলে (মন্ত্রী) মহেশ ঘোষকে কাঁধে করে লইয়া বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যায় (তখন মদন রায়চৌধুরী মন্ত্রীকে ডেকে বলছেন) দেখ মন্ত্রী, আমার মহেশ ঘোষ আর প্রাণে বাঁচবে না। (তখম মন্ত্রী বলছে) আচ্ছা প্রাণে বাঁচে কি না আমি একবার চেষ্টা করে দেখব, ঐ কথা বলে (মন্ত্রী) পীর

মোবারক গাজীর নাম স্মরণ করে এক মুঠা মাটি লইয়া মহেশ ঘোষের গায়ে মাখাইয়া দেয়, দিবা মাত্র মহেশ ঘোষের গায়ের জ্বালা নির্ব্বাণ হয়ে যায়। মহেশ ঘোষ তখন উঠিয়া দাঁড়ায় (মদন রায়চৌধুরী তখন মন্ত্রীকে ডেকে বলছেন) দেখ ভাই মন্ত্রী তুমি বেশ মন্ত্র যান যে মহেশ ঘোষের গায়ের জ্বালা একেবারে নির্ব্বাণ হয়ে গেল। (তখন মন্ত্রী বলছে) (ধুয়া) মন্ত্র নয় মহারাজ গুণধাম, মন্ত্র তন্ত্র এই পর্যন্ত পীর মোবারক গাজীর নাম - ওরে ও তার মায়া - মায়া বোঝা ভার গো ওরে ও তার মায়া (তখন মহারাজ বলছেন) কে সে মবারক গাজী (তখন মন্ত্রী বলছে) আপনার যে তালুকের মধ্যে গুটিয়ারী সরিপ বলে যে জায়গা আছে ঐখানে বাবাজির মোকাম, ঐখানে বাবজি আছেন, সেই বাবাজির নাম স্মরণ করে সেই বাবাজির নাম অন্তরে গেঁথে এক মুঠা মাটি নিয়ে আমি মহেশ ঘোষের গায়ে মাখিয়ে দিয়াছিলাম সেই জন্য বাবাজির কৃপায় মহেশ ঘোষের গায়ের জ্বালা নির্ব্বাণ হয়ে গেছে। (মহারাজ বলছেন) তিনি এমন গুণের পীর। (মন্ত্রী বলছে) মহারাজ, এমন গুণের পীর কি আপনি যে বিপদে পড়েছেন যদি তাঁকে ধরতে পারেন তাহা হলে আপনাকে এ বিদন হতে উদ্ধার করে দিতে পারেন। (মহারাজ বলছেন) দেখ মন্ত্রী সেখানে যেতে গেলে কত টাকা নিয়ে মানসিক করতে হবে? (মন্ত্রী বলছে) যার যে রকম ক্ষমতা কেউ পাঁচ পয়সা নিয়ে যায়, কেউ পাঁচ টাকা নিয়ে যায়। (তখন মহারাজ বলছেন) দেখ মন্ত্রী তুমি সোনারপুর বাজার হতে পাঁচ টাকার ফুল সির্ণি এনে দাও আজ ভোরে বাবাজির কাছে মানসিক করতে যাব। তখন মদন রায়চৌধুরী এক মনে মোবারক গাজীর নাম স্মরণ করে বলছে (গীত) কাল নিশা ভোরে একমনে ঘুটিয়ারী যাব, কেমন গুণের পীর মোবারক গাজী নয়নে হরিব, যদি মোরে উদ্ধার করেন দয়ার সাগর পীর, বাবার চরণধুলি হাতে তুলি আমি ভক্তিভাবে খাবো যার কৃপাতে জমের হাতে মুক্তি আমি পাবো, জন্মাবধি নিরবধি বাবার দাস হয়ে রহিব। তখন মন্ত্রীকে ডেকে বলছেন তুমি পাল্কী সাজন কর আজ ভোরে বাবাজির কাছে মানসিক করতে যাব, তখন ভোরে উঠিয়া মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া মদন রায়চৌধুরী পাল্কী উঠে করিল গমন। রাজপুর গ্রাম রাজা পার হয়ে যায় সোনারপুর গিয়া তখন উপনীত হয়, সোনারপুর গ্রাম রাজা পার হয়ে যায়, আড়াপাঁচ গ্রামে তখন উপনীত হয় আড়াপাঁচ গ্রাম

রাজা পার হয়ে যায়, নভাষান গ্রামে তখন উপনীত হয় নভাষান গ্রাম রাজা পার হয়ে যায়, নারানপুর গ্রামে তখন উপনীত হয় নারানপুর গ্রাম রাজা পার হয়ে যায়, গোড়দহ কাছারী বাড়ি উপনীত হয়। (তখন মহারাজ মন্ত্রীকে ডেকে বলছেন) দেখ মন্ত্রী এই ত গোড়দহ কাছারী বাড়িতে এলাম বাবাজির মোকাম কোথায় (মন্ত্রী বলছে) ঐ যে সামনে জঙ্গল মধ্যে একটী লাল পতাকা উড়ছে। ঐ বাবাজির মোকাম, তখন মদন রায়চৌধুরী সির্ণির হাঁড়ি মাথায় করে নিয়ে যেতে ছিল। অন্তর্যামী বাবাজি অন্তরে জানিল, তখন পঞ্চম বর্ষ শিশু হয়ে বাবাজি পথে বসেছিল। (মহারাজ মন্ত্রীকে ডেকে বলছেন) কৈ মন্ত্রী বাবাজি কোথায় (মন্ত্রী বলছে) ঐ যে পথে আসতে দেখিলেন রাস্তার উপর একটি ছেলে বসে আছে ঐ হচ্ছেন গুণের বাবাজি। তখন মদন রায় সির্ণির হাঁড়ি মাথায় করে বাবাজির কাছে গিয়ে বাবাজির পদতলে হাঁড়িটি রাখিয়া বাবাজিকে ডেকে বলছে (গীত) রাখ রাখ দাসের চরণ তলে, রাখ রাখ, এলাম চরণ পাব বলে, রাখ রাখ, রাঙ্গা চরণ পাব বলে, এলাম আসাকরে রাখো রাখো ও দয়াময় ও চরণ তলে আমায় রাখো রাখো এলাম চরণ পাব বলে রাখো রাখো, তখন বাবাজি নিজ মুর্ত্তি ধারণ করে মদন রায়কে ডেকে বলেছেন দেখ মদন রায় আমার মক্কার পুকুরে মাটি কাটতে যেতে হবে (তখন মদন রায় বলছেন) হ্যাঁ বাবাজি আমি কাটব, মদন রায়কে নিয়ে বাবাজি মক্কার পুকুরে মাটি কাটতে গেল মদন রায় কোদাল নিয়ে মাটি কাটতে লাগল, এক কোপ দুই কোপ তিন কোপের পর বাবাজির কৃপায় মদন রায়ের কোমরের কাপড় গেল সরে। কোদাল রেখে মদন রায় সাপটে নিতে ছিল। বাবাজি তখন মদন রায়ের হাত ধরে বলছেন (ধুয়া) আর হবে না সোনার যাদু আজ আমার বাক্য লবে, তিন পুরুষের বেশী তোমার জমিদারী নাহি রবে (গো) ওরে ও তার মায়া - মায়া বোঝা ভার গো ওরে ও তার মায়া। (তখন মদান রায় বলছেন) বাবাজি গো আমি এবার পরপর একশত কোপ মারবো তখন বাবাজি বলছেন আর হবে না সোনার যাদু শুন আমার ঠাঁই যে বাক্য বলছে এ বাক্য রদ হবার নাই গো, ওরে ও তার মায়া - মায়া বোঝা ভার গো ওরে ও তার মায়া। (তখন বাবাজি বলছেন) তুমি কি কারণে এসেছে আমি বুঝিতে পেরেছি। তুমি যেদিন ঢাকা শহরে যাবে আমি সেই দিন যাব, (মদন রায় তখন বলছেন) বাবাজি

গো যদি আমার মামলায় হয় জিৎ মক্কায় মস্‌জিদ আর সোনা রূপার চিচ মানসিক করিয়া মদন রায় আপন বাড়িতে আসিল, আপন মাকে ডেকে কহিতে লাগিল (গীত) কর আশীর্ব্বাদ যেন মনো সাধ পূর্ণ হই মাগো বিদায় হই চরণে, পীর মোবারক গাজী যদি হয় মা রাজি তবে ফিরে মাগো আসিভ ভবেন, ওমা তোর নয়নের বারি সহিতে না পারি, বুকে শেল বাজে উহু মরি মরি ভবসিন্ধু বারী পার হতে মা পারি তবে ফিরে মাগো আসিব ভবনে। তখন মদন রায় পাল্কী সাজিয়ে মন্ত্রী সংগে লয়ে অতি ভোরে বিদায়, রাজপুর ছাড়িয়া সোনারপুর গিয়া উপনীত হয়, সোনারপুর গ্রাম রাজা পার হয়ে যায় হওড়া গিয়া তখন উপনীত হয়, হাওড়া গ্রাম রাজা পার হয়ে যায় শিবপুর গিয়া তখন উপনীত হয়, শিবপুর গ্রাম রাজা পার হয়ে যায় তেঁতুল বেড়ে গিয়া তখন উপনীত হয়, তেঁতুল বেড়ে গ্রাম রাজা পার হয়ে যায় বর্জৎদগ্নি গিয়া তখন উপনীত হয়, বর্জৎদগ্নি গ্রাম রাজা পার হয়ে যায় ফরিদপুর গিয়া তখন পার হয়ে যায় ফরিদপুর জেলা তখনপার হয়ে যায় মৈমন সিং গিয়া তখন উপনীত হয়, মৈমন সিং জেলা তখন পার হয়ে যায় ঢাকার শহরে গিয়া তখন উপনীত হয়। ঢাকার শহরে যখন গিয়াছিল বেলা চারিটা বেজে যায়, (মন্ত্রী তখন মহারাজকে ডেকে বলছে) আজ এই মাঠের মাঝে তাঁবু খাঁটিয়ে থাকতে হবে, রাত প্রভাত হলে নবাবের নিকট যাবো, মদন রায় মন্ত্রী তাঁবু মধ্যে ছিল, রাতদুপুরের সময় মদন রায়ের ঘুম ভেঙে গেল, মদন রায় ভাবিতে লাগিল আমি ত ঢাকায় এলাম কিন্তু বাবাজি কোথায় তখন কাঁদতে কাঁদতে মদন বলছে (গীত) কোথায় দয়াময় আমি কাতরে ডাকি তোমারে, কোথায় দয়াময়। শুনেছি গো বাবা অগতির গতি তোমা বিনা আর নাহি অন্যগতি এ ঘোর সঙ্কটে কর আমার মুক্তি, শক্তিময় শান্তি, পাপ জীবনে, কোথায় দয়াময় আমি কাতরে ডাকি তোমারে কোথায় দয়াময়। ঐ ভাবে যখন ডাকিতে লাগিল অন্তর্যামী বাবাজি তখন অন্তরে জানিল দুখিকে ডেকে কহিতে লাগিল দেখ বাবা দুখি আমার দেহখানা চৌদিকে থাকবে আমি ঢাকার শহরে মামলা করতে যাব। ঐ কথা বলে দেহ রেখে সোনার ভ্রোমোর হয়ে উড়ে চলে যায় ঢাকার শহরে গিয়া উপনীত হয়, তাঁবুর উপরে মদন রায়কে এই কথা কয় (গীত) আমি, কেঁদনা ২ যাদুমনি আর কেঁদনা, (তুমি) নয়ন মুদে যারে ডাকিতেছিলে, মাথার উপর আছেন তিনি, কেঁদনা ২

যাদুমনি আর কেঁদনা। মদান রায়ের নিকট দেখা দিয়া বাবাজি তখন হলেন বিদায় নবাবের ঘরের মধ্যে গিয়া উপনীত হয়, নবাবের কর্ণে মুখ দিয়া স্বপন দেখায় (বলে) শুন ২ নবাব সাহেব হওরে চিতন শিহরে পীর ফকির বসে আছে ঘুমে এত মন, দেখ নবাব সাহেব কাল প্রভাতে তোমার কাছে মদন রায় আসবে তাকে শাল দিবে কাপড় দিবে, দিবে যোড়া যোড়া, মদন রায়কে বক্সিস করবে চড়নের ঘোড়া, স্বপন দেখিয়ে বাবাজি বলছে এক দুই তিন কথা রদ হয়ে যায় স্ববংশ নির্ব্বংশ করব অধম ফকির কয়ে যায়। বাবাজি তখন জমিদারী দপ্তরখানা গিয়া তখন উপনীত হয় আপন রূপে ঘর আলো হয়ে যায় মদন রায়ের বাকির খাতা খুলে দেখে তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকা বাকি (হাসতে ২ বাবাজি তখন বলছে) দেখ মদন রায় এ পর্য্যন্ত নবাব সাহেবের হাতে হাত দাও নাই, আচ্ছা আমি যখন অভয় পদ দান করেছি, অভয় পদ দিয়া যাব, ঐ কথা বলে বাবাজি ঐ সকল টাকা কেটে দিয়া এক লক্ষ টাকা জমা বসাইয়া আপন মোকামে গিয়া উপনীত হয়, আপন দেহ মধ্যে প্রবেশ গিয়া হয়, দেখিতে ২ নিশি প্রভাত হয়ে যায়, এদিকে নবাবের ঘুম ভেঙে যায়, নবাব পাত্র মন্ত্রীগণকে ডেকে এই কথা কয়, শুনে পাত্র মন্ত্রীগণ একটি ঘোড়া আর ভাল শাল দুইটি ভাল কাপড় দুইটা রাজ কাছারীতে ঠিক করিয়া রাখে। এমন সময়ে মদন রায় রাজ কাছারী আসিয়া উপনীত হয়, নবাব সাহেব মদন রায়ের বাকির খাতা খুলে দেখে, সমস্ত টাকা কাটা এবং এক লক্ষ টাকা জমা আছে, তখন ঐ সকল দৃশ্য দেখে নবাব ভাবিতে লাগিল, পীর মোবারক গাজী আমাকে স্বপন দেখিয়ে গেছে তাঁর কথা যদি না মানি আমার বংশ নির্ব্বংশ হয়ে যাবে। তখন তরা করে চড়নের ঘোড়া লইয়া ঐ সকল জিনিষপত্র লইয়া মদন রায়কে পুরস্কার করিয়া বিদায় করে দেয়। মদন রায় রাজ কাছারী হতে বিদায় হতে যায় জেলখানার কাছেগিয়া উপনীত হয়। জেলখানার মধ্যে এগারো জন কয়েদি পরস্পর এই কথা কয় ও ভাই সকল মদন রায় জেলের মধ্যে না পড়ে কত পুরস্কার পেয়ে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, দেখ ভাই শুনেছি পীর মোবারক গাজী ওর সহায় হয়েছে। দেখ ভাই, আমরা কেন মরি, ঐ বাবাজি দহাই দিয়ে মদন রায়কে ধরি, তাহলে হয় ত আমরা উদ্ধার হতে পারি। (তখন কয়েদিগণ মদন রায়কে ডেকে বলছে) শুন ২ মদন রায় আজ আমাদের বাক্য

লবে, আমাদের যদি না উদ্ধার কর তোমার গাজীর মাথা খাবে। অন্তর্যামী বাবা তখন অন্তরে জানিল মদন রায়ের পাল্কী ভার হয়ে গেল মদন রায় মন্ত্রীকে ডেকে কহিতে লাগিল, দেখ মন্ত্রী একি হলো। (মন্ত্রী বলছে) ঐ এগারো জন কয়েদি বাবাজির দোহাই দিয়েছে বলে। আপনি এক কাজ করুন পাল্কী হতে নেমে নবাবের কাছে যান, গিয়ে বলুন এগারো জন কয়েদিকে জেল খোলসা করে দিন, ওদের হয়ে জামিন হয়ে লব কিস্তির ২ কিছু ২ টাকা আমি পাঠাইয়া দিব। মদন রায় নবাবের আদেশ লইয়া উহাদের জেল মুক্ত করে দেয়। এগারো জন কয়েদি মদন রায়কে ডেকে এই কথা কয়, দেখ মদন রায় আমরা এগারো জন এগারোখানা তালুক তোমাকে পুরস্কার করিলাম। বক্সিস পেয়ে মদন রায় আপন বাড়িতে গিয়া উপনীত হয়। তখন মদন রায় মন্ত্রীকে লইয়া ও মাকে লইয়া সাত খাসি জবাই করে সাতটি হাঁড়িতে ভরে সাতটি তিউড়ি মধ্যে বাসই দাও। দুখি সেই মত কাজ করিল। বাবাজি বলছে, দুখি? গোটাকতক বেনা এনে দাও, দুখি বেনা এনে দিল। বাবাজি আতোষ নামা কলমা পড়ে বেনায় ফুঁক দেয়, দপ করে জ্বলে উঠে অমনি নিভে যায়। গাছ কতক ২ হাঁড়ি পোঁদে লাগাইয়া দেয়, দুখিকে ডেকে এই কথা কয়, ও বাবা দুখি পীর মুর্শিদের নামে হাজত করে দাও। (দুখি তখন বলছে) বাবাজি গো কাঁচা মাংস সিদ্ধ হল না হাজত করে দিব কি করে। (বাবাজি বলছে) 'তুমি হাঁড়ি খুলে দেখ না, দুখি হাঁড়ি খুলে দেখে, মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে। দুখি তখন হাজত করে দিয়ে বলছে, (ধুয়া) শুন ২ বাবাজি গো আমার মন হয়েছে স্থির। নিশ্চয় জেনেছি তুমি জাহিরর পীর। (মদান রায় মানসিক চুকিয়ে দিয়ে বলছেন) বাবাজি গো আমি প্রতি বৎসর প্রথম অম্ববাচির দিন হাজত দিয়া যাব, এই সত্য আমার রহিল। ঐ কথা বলে মদান রায় আপন বাড়িতে আসি উপনীত হল। (সমাপ্ত)

এর বহু বছর পর প্রাবন্ধিক অমরকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী যিনি মদন পালা আবিস্কার করেছিলেন, তিনি দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় জহুরনামা নামে একটি গ্রন্থ আবিস্কার করেছিলেন এবং বিস্তারিত ভাবে সমাজ শিক্ষা পত্রিকায় তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

উপরোক্ত 'গাজীর গান' মদন পালার কুলগাঁথা ও রায়মঙ্গল কাব্য হইতে

প্রমাণ হয় মদন রায় শায়েস্তা খাঁর আমোলের লোক। নবাব শায়েস্তা খাঁ ঢাকার নবাব ছিলেন ১৬৬৪ - ৮৬। কোন কোন নব ঐতিহাসিক প্রমাণ করিয়াছেন প্রতাপাদিত্যের বন্ধু ভগ্নিপতি ও সেনানায়ক মদনমল্ল নাম অনুসারে মেদনমল্ল পরগণা নাম হইয়াছে। তিনি হয়ত জানেন না মল্ল উপাধি প্রাপ্ত মদন মোহন ছিলেন মিতরে বংশীয়। প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের সময়টা ১৫৫৮ - ১৬১০। আমাদের আলোচ্য মদন হচ্ছেন সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। তিনি আরও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মদন রায়ের নাম অনুসারেই রাজপুর-এর নাম হয়। ইহার সর্ব্বৈব ভ্রান্ত ও মিথ্যা। কারণ মদন রায়ের পিতা রাজবল্লভ দত্ত (রায়) 'রায়' উপাধি পান গৌড় অধিপতির সময়ে। কৃষ্ণদাসের সময় থেকেই মেদনমল্ল পরগণায় জায়গীর লাভ করেন তার প্রমাণ পূর্বেই করেছি। কারণ প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর রাজা মান সিংহ গুরু কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্তকে যে ৬টি পরগণা দেন যাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে মেদনমল্ল নাই। বা ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে নদীয়ার রাজা ভবানন্দ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ যে ১৪টি পরগণা পান সেখানেও মিদুইমুল (মেদনমল্ল) পরগণার নাম নাই। অথচ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময়ে তার হিন্দু সেনাপতি তোডরমল বাংলা সুবাকে প্রথম জরীপ করেন। যে জরীপের নাম 'আসলি-জমা-তুমার'। এই জরীপের বর্ণনা দিয়েছেন সম্রাটের মন্ত্রী আবুল ফজল তাঁর সু-বিখ্যাত 'আইন-ই-আকবরিতে'। এই গ্রন্থে প্রথম দেখতে পাওয়া যায় মেদনমল্ল পরগণা সরকার সাতগাঁওর অধীনে যাহার খাজনা তখন ছিল ১,৮৬,২৪২ আকবর শাহী দাম। না জেনেশুনে ইতিহাসের বিকৃতি করার কোন অপচেষ্টার দ্বারা কখনই বোঝানো উচিৎ নয় যে কখনও ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করে বা বাঘের সাথে লড়াই করে প্রতাপাদিত্যের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বলে প্রতাপাদিত্য মদন রায়কে 'মল্ল' উপাধি দিয়া মদনমল্ল পরগণার নাম করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সু-বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ১৬শ শতাব্দীর কবি কংকন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তার সু-বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে জগন্নাথ দর্শন ও ধনপতি স্বদেশ মাত্রা প্রসঙ্গে এই পরগণার নাম থাকে কেমন করে। (দক্ষিণে মেদনমল্ল / বামে বিরখানা)

এই প্রসঙ্গে বলা ভালো অতি সম্প্রতি একটি দলিল হইতে জানা যায় মদন

রায় ১১০৯ বঙ্গাব্দে (১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন। বারুইপুরের জমিদারী সেরেস্তোয় - কাছারীতে যে সমস্ত কাগজপত্র উদ্ধার করা গেছে, তাহা হইতে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। কেহ তাহা না দেখিয়া ইতিহাসের অপব্যাখ্যা দিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে পীর মোবারক গাজীর দেহান্তের কথা বলি, একবার মেদনমল্ল পরগণায় অনাবৃষ্টি দেখা যায়। ভক্ত বৃন্দের আকুল আবদনে সাড়া দিয়ে 'বাবা মোবারক গাজী' তার দেহটিকে ঘুটিয়ারীতে রেখে আত্মাটিকে মক্কায় নিয়ে যান বৃষ্টি আনার জন্য। তিনি বারণ করে গিয়ে ছিলেন যে যতক্ষন দরজা তিনি নিজে না খুলবেন ততক্ষন যেন কেহ দরজা না খোলে। তার বারণ সত্ত্বেও তার কতিপয় ভক্ত দরজা জোর করে খুলে দেখেন যে 'গাজী বাবার প্রার্থনায় মগ্ন নিথর দেহটি' তারা মৃত ভেবে কবর দিয়ে দেন, রাতে বাবা নিজ সন্তান ও জমিদার মদন রায়কে স্বপ্নে সব জানিয়ে দেন এবং বলেন এই দিন অর্থাৎ ৭ই আষাঢ় মদন রায় বা তার বংশের পূজা না হলে তার কাছে সর্ব্ব-সাধারণের যে প্রার্থণা হোক না কেন, সেই প্রার্থণা পূজার কোন মূল্য নাই। এবং যতদিন মদন রায়ের বংশ মেদনমল্ল পরগণায় বসবাস করবে ততদিন ৭ই আষাঢ় যতই খরা হোক না কেন ঐ দিন বৃষ্টি হবেই হবে এবং বাবার আদেশে সেই কবর স্থানের উপর মদন রায় 'দরগা' নির্মাণ করেন, সেই থেকে আজও অবধি অম্বুবাঁচির দিন অর্থাৎ ৭ই আষাঢ় তাহার দেহান্তের দিনটি মদন রায়ের পরিবারের পূজার পর সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানদের পূজা হয়।

রাজপুর জমিদারির শেষ যুগ

এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় মদন রায় পৌত্র দুর্গাচরণ রায় (ইনি চৌধুরী উপাধি পান) ও বারুইপুরে একটি কাছারী বাড়ি নির্মাণ করেন। এর পুত্র সন্তান না থাকায় কালী শংকরকে দত্তক গ্রহণ করেন। হরিনাভীর দুর্গাচরণ মিত্রের পুত্রকে দত্তক লইয়াছিলেন এবং তাহার নাম রাখেন কালী শংকর রায়। ঐ পুত্রের মৃত্যু হইলে পুনরায় দ্বিতীয় বার ১১৮৪ বঙ্গাব্দে ১৩ই মাঘ দত্তক লহেন ধপধপির নিবাসী ঘনশ্যাম ঘোষ-এর পুত্রকে এবং তাহারও নাম রাখেন কালী শংকর রায়। দুর্গাচরণের

পত্নীর নাম ঠাকুরানী। দুর্গাচরণ বারুইপুরে আদিগঙ্গার তীরে যেখানে শ্রীচৈতন্য এর পদধুলীর অনতিদূরে সদাব্রত উৎযাপন করেন। সেই থেকে আদিগঙ্গার তীরের এই ঘাটটির নাম সদাব্রত ঘাট হিসাবে প্রসিদ্ধ। ইনি রাজপুরে আনন্দময়ী (কালী) দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তা দুর্গামঙ্গল ও হরপার্বতী মঙ্গল কাব্যে বলা আছে। এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত গাজীর গানে যা বলা আছে তা আগেই হুবহু তুলে দিলাম।

প্রায় বিশ বর্ষের উপর হইল মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মহাশয়ের 'হর-পার্বতী-মঙ্গল' নামক একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের পরিচয় লিখিয়া পাঠান। তৎকালীন আমি সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। মূল গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হস্তগত না হওয়ায় গ্রন্থ বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই। এই 'হর-পার্বতী-মঙ্গল' গ্রন্থকার এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ....

জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ মেদন-মল্লানুরাগ
অধিপতি শ্রী মদন রায়।
নিজে মোবারক গাজী আপনি হইয়া রাজি
বনমাঝে দেখা দিলা তায়।
দত্তকুল - সমুদ্ভব গোষ্ঠীপতি খ্যাতি রব
কায়েস্থ কুলের অধিকারী।
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ পঞ্চম তনয় নিজ
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব জমিদারী তাহে বর্ত্ত
তদঙ্গজ শ্রী দুর্গাচরণ।
সহায় আনন্দময়ী সব্বাংশে হইল জয়ী
শ্রীমতী 'শ্রীমতী' যার রাণী।
করিয়া সমাজস্থান কতভুমি কৈল দান
বারুইপুরেতে রাজধানী।
তস্য পুত্র গুণধাম শ্রী কালীশঙ্কর নাম
অল্পকালে হইল লোকান্তর।

তস্য পুত্র মহাশয় শ্রী রাজবল্লভ হয়
চৌধুরী বিখ্যাত সর্ব্বত্তর ।।
শৌর্য্য বীর্য্যে ধৈর্য্য ধরা আবিবাদে পালে ধরা
গাম্ভীর্য্যেতে রঘুপতি রাম।
অধিকার ইংরাজী কেহ করি কারসাজী
কিছু গ্রাম করায় নিলাম ।।
তার মধ্যে বাসস্থান হরিনাভী সমাখ্যান
কিনিলেন দুর্গারাম কর ।
নহেন সামান্য ব্যক্তি গুরুদেব দ্বিজে ভক্তি
কীর্ত্তি কত দেশ দেশান্তর ।।
উভয়ত গুণ যোগী কিন্তু যার বৃত্তিভোগী
আশীর্ব্বাদ করি পুনঃ পুনঃ ।
কবীন্দ্র মাতামহকুল ইষ্ট যার অনুকুল
পিতৃ পরিচয় কিছু শুন ।
মুখুটী বিখ্যাত কুলে মেলবদ্ধ যার কুলে
শঙ্করের তনয় গোপাল ।
ভরদ্বাজ মুনি অংশ কানাই ঠাকুর - বংশ
আদান প্রদানে সব ভাল ।।
তিন কুল ভঙ্গ নিজ মাহিনগরেতে দ্বিজ
কামদেব সার্ব্বভৌমখ্যান ।
বিবাহ তনয়া তারি তাহাতে সন্তান চারি
রামধন তৃতীয় সন্তান ।।
তদঙ্গজ রামচন্দ্র ইষ্ট চরণারবিন্দ
একান্ত হৃদয় মাঝে ভাবি ।
বিনোদরাম সুতাসুত রচিল বিনয়যুত
সম্প্রতি নিবাস হরিনাভী ।।

'হরপার্ব্বতী মঙ্গলের' গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় হইতে জানা যাইতেছে, কবি রামচন্দ্র মুখটী বারুইপুরের জমিদার রাজবল্লভ রায় চৌধুরীর আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত রাজবল্লভ রায়ের বৃদ্ধ পিতামহ হইতেছেন, রাজা মদন রায়। এই মদন রায় মোবারক জাগীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, এইটুকু পরিচয় 'হরপার্ব্বতী মঙ্গল' হইতে পাইয়াছিলাম।

এই প্রসঙ্গে দুর্গামঙ্গল কাব্যটিও তুলে দেওয়া হল .....

মদনমল্ল অধিপতি ছিল মদন রায়।
দেবানুগৃহীত রায় কি বলিব তায়।।
দান্ত, শান্ত, সুশীল, সুধীর, সুগভীর।
যাহা হইতে মোবারক গাজীর জাহির।।
তাহার নন্দন পাঁচ কনিষ্ঠ শ্রীরাম।
জমিদারী হৈল তাঁর দেখি গুণগ্রাম।।
তাঁহার তনয় দুর্গাচরণ চৌধুরী।
অদ্যাপি তাঁহার গুণ সবে স্মরে ঝুরি।
প্রায় অধিকার তাঁর ব্রাহ্মণের সাৎ ।
আনন্দে আনন্দময়ী তাঁহার সাক্ষাৎ ।
তার পুত্র কালীশঙ্কর সুশীল সুধীর ।
পিতৃতুল্য পুত্র বটে - চতুর সুস্থির ।।
অল্পকালে অবনী ত্যাজিলে মহাশয় ।
শ্রী রাজবল্লভ রায় তাঁহার তনয় ।।
শৌর্য্য বীর্য্যে গাম্ভীর্য্য সুচার্য্য সুপ্রতাপে ।
শত্রুগণ সশঙ্কিত সদা অঙ্গ কাপে ।
নবাবের অধিকার লইয়া ইংরাজ।
কলিকাতা কোম্পানীর হইল সমাজ।।
রাজস্ব দেখিয়া বাকী নীলামে হুকুম
খাজনা তলবে বড় লেগে গেল ধুম ।।

ওজর করিয়া রায় না দিল খাজনা ।
নীলামে খরিদ কৈল দুর্গারাম কর ।
গ্রন্থবাড়ে গুণাগুণ বলিতে সকল ।
শ্রীকবি কেশরী কহে শ্রী দুর্গামঙ্গল ।।

উপরে উদ্ধৃত রচনায় দুর্গাচরণই যে আনন্দময়ী (কালী) প্রতিষ্ঠাতা তা 'দুর্গামঙ্গল' ও 'হরপার্ব্বতী মঙ্গল' উভয় পুঁথিতেই বলা হয়েছে। বারুইপুরে ছিল রায়চৌধুরীদের সদর কাছারী রাজধানী বলে যা 'হরপার্ব্বতী মঙ্গল' পুঁথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। হরিনাভীর নিত্যধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (অধক্ষ্য সম্পাদক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়) (১৩৪০ সাল) যা লিখেছেন তার থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল। '১১৫৭ সালে দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয় হরিদেব চট্টোপাধ্যায়কে ব্রহ্মাত্তর দেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবী আনন্দময়ী মায়ের মন্দির রাজপুরে ছিল। উপরোক্ত দুর্গামঙ্গলে পরিস্কার লেখা আছে, মদন রায়ের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ দুর্গাচরণ রায়। এই দুর্গামঙ্গলের এক জায়গায় আছে ... 'নবাবের অধিকার লইল ইংরাজ। কলিকাতা কোম্পানির হইল সমাজ।' অর্থাৎ ঐ খ্রীঃ ১৭৬৫ সালের কথা, সে সময়ে এদেশে ইংরেজী রাজত্বর সূচনার সূত্রপাত হলো। এই আনন্দময়ী কালীর মন্দির ১৭শ শতকে নির্মিত সোনারপুর থানায় রাজপুরের হাট টাইপ চার চালা মন্দিরের অনুপম নিদর্শন। এই সুপ্রাচীন মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য সঠিক ভাবে কবে আরম্ভ হয়েছিল, তা অনুমান সাপেক্ষ। তবে 'চব্বিশ পরগণার মন্দির' গ্রন্থে লেখক অসীম মুখোপাধ্যয় এই মন্দির সম্পর্কে যা বলেছেন তা হুবহু তুলে দিলাম। তবে লেখক ভুল করে এই মন্দিরটি অন্নপূর্ণার বলেছেন, জানি না তা তিনি কোথায় পেলেন, যাই হউক তিনি কি লিখেছিলেন তা দেখা যাক - নাতি উচ্চ ভিত্তি ভূমির উপর একক অলিন্দভুক্ত গর্ভ গৃহের শেষ চিহ্ন আজও বিদ্যমান। আচ্ছাদনের প্রকৃত রূপ নির্ণয় করতে হলে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। আঞ্চলিক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আচ্ছাদনটি সম্ভবতঃ চার চালা বা আট চালা ছিল। গর্ভ গৃহের বর্হিঃ বিভাগে এখনো কল্পলতা, পদ্ম, পাখী ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু আছে। রামায়ণের কয়েকটি গতানুগতিক বিষয়, যেমন ... রাম ও রাবণের যুদ্ধ, বনের ভক্ষনরত কুম্ভকর্ণ,

হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়ন - বিভিন্ন আকারের ফলকে অলিন্দের সম্মুখে সন্নিবিষ্ট ছিল। আজ অলিন্দের অবস্থান ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। খিলান সহ দেওয়ালটি ভূপতিত হয়েছে।

রায়চৌধুরী পরিবারের অগ্রসর

এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় কালীশঙ্কর রায়। ইনি বারুইপুরে চলে আসেন কুলদেবী আনন্দময়ীকে (কালীকা দেবী) নিয়ে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পতনের পর যখন ২৪ পরগণার জমিদারী ইংরাজ কোম্পানী পাইল এবং ১৭৬৫ সালে যখন নবাবের অধিকার ইংরেজ কোম্পানী নিয়ে ইংরেজ রাজত্বর সূচনায় হয়, সেঁই সময়ে সু-চতুর কালিশঙ্কর রায় বারুইপুরে কাছারী বাড়ীতে চলে আসেন, সম্প্রতি কালিশঙ্কর রায়ের স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পাওয়া গেছে যা থেকে জানা যায় তখন তিনি বারুইপুরে বসবাস করতেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ইহা আছে।

এই প্রসঙ্গে দুর্গামঙ্গল কাব্যটির কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল,

'তার পুত্র কালীশংকর সুশীল সুধীর।
পিতৃতুল্য পুত্র বটে - চতুর সুস্থির ।।
অল্পকালে তবলী ত্যাজিলে মহাশয়।
শ্রী রাজবল্লভ রায় তাঁহার তনয় ।।
শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য সুচার্য্য সুপ্রতাপে।
শত্রুগণ শংঙ্কিত সদা অঙ্গ কাঁপে ।।
নবাবের অধিকার কোম্পানীর লইয়া ইংরাজ।
কলিকাতা কোম্পানীর হইল সমাজ ।।
রাজস্ব দেখিয়া বাকী নীলামে হুকুম।
খাজানা তলবে বড় লেগে গেল ধূম ।।
ওজর করিয়া রায় না দিল খাজনা।
নীলাম হইল তার কিছু পরগণা।
নূলামে খরিদ কৈল্যে দুর্গারাম কর ।।

উপরে উদ্ধৃত রচনায় প্রমাণ হয় রাজবল্লভ রায় - এর সহিত খাজানা নিয়ে গণ্ডোগোল হয় ও তবে জমিদারীর কিছু অংশ নীলাম হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোর (১৭৯৩) ফলে বহু প্রাচীন ও প্রায় স্বাধীন ভূস্বামীর জমিদারী নীলাম হয়ে যায়। দুর্গারাম রায় কর নীলামে রাজপুর, হরিনাভী গ্রাম ক্রয় করেন।

বারুইপুর ও রায়চৌধুরী পরিবার

রাজবল্লভ রায়চৌধুরী বারুইপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ১২১৩ বঙ্গাব্দের ১০ই আশ্বিন (ইং- ১৮০৭ খ্রীঃ ৭ই জুলাই) রাজবল্লভ রায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোঃ-এর নিকট হইতে পুনরায় মেদন মল্ল পরগণা ও পেঁচাকুলি পরগণার জমিদারী পরোয়ানা পান ও চৌধুরী উপাধী পান।

জমিদার রাজবল্লভ রায়ের সহিত ইংরেজদের খাজনা ও জমি নিয়ে বিবাদ দেখা দেয়, তার বিবরণ ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত ফ্রেডরিক ইডেন পারগিটার সাহেব তার রচিত 'সুন্দরবন রেভিনিউ' ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। উক্ত বইটির কিছু অংশ বঙ্গানুবাদ করেন সৌরেন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী, ইনি সভাপতি - বারুইপুর কোর্টের বার কাউনসিলের উক্ত বই টি থেকে হুবহু তুলে দেওয়া হল।

১৭৯১ সাল হইতে ১৮১৩ সাল অবধি যশোহরে সুন্দরবন বিষয়ক সংক্ষিপ্ত ইতি হাস (১৭৯২ - ১৮১৩)

২৪ পরগণার অন্তর্গত বাশড়া মৌজা হইতে হাসনাবাদ অঞ্চল অনুদান প্রদত্ত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সমস্ত অঞ্চলে জরীপের কার্য করা করা হইলে দেখা যায় যে, ৮০,০০০ হাজার হইতে ৯০,০০০ হাজার বিঘা জমি - ইহার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমে ২৫,০০০ হাজার জমি চাষাবাদ এবং ৪,০০০ হাজার পতিত জমি নানা জমিদার কর্তৃক উদ্ধার করা। কিন্তু রায়মঙ্গলের পশ্চিম ও বিদ্যাধরীর দক্ষিণে বিস্তৃত অঞ্চল রাজবল্লভ রায়ের দখলে থাকে, এবং পূর্ব বকেয়া জমি জঙ্গলা জমি - যাহার মালিক ওয়েন জন ইলাহিম এর মালিকানায় কোন প্রমাণ ছিল না। বকেয়া ও ভবিষ্যতের কর আদায় করার জন্য সুন্দরবন জরীপ করা হয়। এবং স্বত্ব ও দখলে কোন বৈধ দলিলাদি দেখাইতে না পারায়, ১৮১৩ সালে

সরকারের সহি চুক্তিবদ্ধ হইতে বলা হয় অন্যথায় জমিদারদের জমি জরীপ করিয়া তাহা ক্রোক করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ সীমান্তবর্তী অঞ্চলের (হেনকলিস্ তালুক সহ) জরীপ করিয়া কর অনাদায়ের জমি জরীপ করিবার আদেশ দেওয়া হয়।

স্কট সাহেবের কার্যাবলী (১৮১৭ - ১৮১৮)

আমিনের দ্বারা দুই রকম জমি - কর আদায়ী ও অনাদায়ী জরীপ করা হয়। ইহার জন্য তিনি আসল লীজ দলিল অথবা কোন দলিলাদি হাত চিঠে ১১৯০ (১৭৮৩) ও মরসন ম্যাপের কপির উপর নির্ভর করেন। এই জরীপের কার্য্যের বিরুদ্ধে স্কট সাহেবকে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সম্মুখীন হইতে হয়। সমস্ত জমিদারবর্গ যেমন- রামরতন মিত্র, রাণী শঙ্করী দাসী প্রচণ্ডভাবে বাঁধা দেন - ইহার মধ্যে রাজবল্লভ রায় অন্যতম (যাহার জমিদারী ২৪ পরগণা, নদীয় এ যশোহর অবধি বিস্তৃত করিয়া নিয়ে ছিলেন)।

জমিদারগণ আসল দলিলাদি দেখাইতে অসম্মত হন, কেবলমাত্র ১১৯০টি হাত-চিটার কপি দেন। এই সমস্ত নথিগুলি বিশ্বাসযোগ্য ছিল না- কারণ, কোনটাই আসল নথির এটেস্টেড কপি নহে, উপরোক্ত অনেকগুলি ছেঁড়া এবং নাজির থানা হইতে যোগসাজসে সৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়।

মালিকহীন জমি লীজ দেওয়া হইবে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিলে, পুনরায় জমিদারগণ বিক্ষোভ দেখান এই মর্মে যে, উক্ত জমিগুলি তাহাদের এস্টেটের মধ্যে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে জমিদার রাজবল্লভ রায় অন্যতম। রেজুলেশন ২ দ্বারা উক্ত জমিদারদের দাবী অনুসন্ধানের পর নস্যাৎ করিয়া দেওয়া হয়।

২৪ পরণা জেলার স্কট সাহেবের কার্যাবলীর বিবরণ (১৮১৪ - ১৮১৬)

১৮১৪-১৫ সালে তিন চাষের জমির অনুসন্ধান শুরু করেন। ও জরীপ করেন ও খাজনার হার ধার্য করিতে অনুসন্ধান করেন। জমিদারগণ পুনরায় বিক্ষোভ করেন তাহার মধ্যে রাজবল্লভ রায় অন্যতম। স্কট সাহেব বারুইপুরে বসবাস করেন এবং দেখেন যে, লবন ব্যবসায়ী ও চক্‌দারদের জন্য চাষের খুব ক্ষতি

হইতেছে। এবং ইহারা সময় সময় জমিদার কর্তৃক উচ্ছেদ হয়। স্কট সাহেবের অনুসন্ধানের রিপোর্ট খুবই বিস্তৃত হওয়ায় কালেকটর বারংবার বোর্ডকে অনুরোধ করেন) স্কট যেন কেবলমাত্র পতিত মহলের বিষয়ে অনুসন্ধানের কার্য চালান।

ঢাকায় থাকা কালীন তিনি সুন্দরবন অঞ্চলের পতিত জমির অনুসন্ধানের কার্য চালান। কিন্তু বোর্ড কর্তৃক বাধা দান করা হয়, কারণ ইহাতে জমিদারদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়া যাইবে।

রাজা রাজবল্লভ রায়

উপরোক্ত গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে রাজবল্লভ রায় ছিলেন একজন স্বাধীন চেতা, তেজস্বী ও একগুঁয়ে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক। রাজবল্লভ বারইপুরে এসে প্রথমেই পিতামহ দুর্গাচরণের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে উদ্যোগী হন, কিছু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এনে বারুইপুর ও তার আশপাশের গ্রামে নিষ্ক্রয়, ব্রহ্মত্র প্রভৃতি সর্তে বসবাস করিয়া সমাজ স্থাপন করেন। রাজবল্লভ কেবল ব্রাহ্মণ বসিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, সংস্কৃত চর্চার জন্য টোল প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদারী থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিটি টোলের জন্য বৃত্তি দেওয়া হতো। বৃত্তির নাম ছিল 'চৌবাড়ী' কেবল হিন্দু বসিয়েই ক্ষান্ত হলেন না রাজা রাজবল্লভ। খৃষ্টীয়, পীরোত্ত দিয়ে বিস্তর নিষ্ক্রয় জমিতে ব্রাহ্মণদের, খ্রীষ্টানদের ও মুসলমানদের তিনি বসিয়েছিলেন, তা সেটেলমেন্ট রেকর্ড এবং ১৮৭২ সালের আদম সুমারী দেখলে বোঝা যায় মঠ-মন্দির, মসজিদ, গীর্জা দিকে দিকে মাথা তুলল, ইংরেজদের সম্পর্কে বারুইপুরবাসীদের রাজবল্লভ প্রথম সাবধান করেন ১৮২০ সাল নাগাদ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জোর পূর্বক খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তর করনের পর থেকে। এই প্রসঙ্গে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তার বঙ্গের রত্নমালায় ২য় ভাগে যা লিখেছিলেন হুবহু তুলে দেওয়া হলো।

চব্বিশ পরগণার অন্তবর্ত্তী বারুইপুর মহাকুমা খৃষ্টধর্ম প্রচারকদিগের একটি প্রধান অধিষ্ঠান স্থান। পূর্ব্বে অনেক সাহেব মিশনারি তথায় বাস করিতেন এবং খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতেন।

একদা একটি বাঙ্গালী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া পিতা - মাতা - ভাই - ভগিনী ও পত্নী পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান দিগের অধিষ্ঠানে অবস্থান করিতে থাকেন। সাহেব

মিশনারিগণ যখন জানিতে পারিলেন। তাঁহার পত্নী আছেন তখন তাঁহার পত্নীকে আনাইয়া খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নতুন খৃষ্টান বাঙ্গালী সাহেবদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, বাঙ্গালীর মেয়ে খৃষ্টানের সংস্পর্শে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং বুঝাইয়া খৃষ্টান করা অসম্ভব অতএব সে আশা ছাড়িয়া দিন। মিশনারিগণ বলিতে লাগিলেন, একবার যদি কোনরূপে তোমার পত্নীকে এই আড্ডায় আনিয়া ফেলিতে পার তাহা হইলে আমাদের ব্যবহারে তিনি এমন আপ্যায়িত হইবেন যে শেষে খৃষ্টান না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। অতএব যেকোন প্রকারেই হউক তাহাকে একবার এখানে আনাইয়া ফেল। বাঙ্গালী খৃষ্টান তাঁহাদের অনুরোধে পত্নীকে বহু কৌশলে একেবারে বারুইপুরের খৃষ্টানদিগের অধিষ্ঠানে আনিয়া ফেলিলেন।

পত্নী, খৃষ্টান-পরিবৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া ভয়ে এত কাঁপিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মুর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। স্বামীর দিকে একবার সজল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া 'এই বুঝি তুমি আমাকে শ্বশুরালয়ে আনিলে' বলিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মিশনারিগণ নব খৃষ্টানের পত্নী আসিয়াছেন শুনিয়া আনন্দে তাঁহাকে বুঝাইতে বসিলেন। রমণী তাঁহাদের পদপ্রান্তে পড়িয়া সানুনয়বচনে বলিতে লাগিলেন, বাবারা, আমাকে ঘরে পাঠাইয়া দিন, আমি খৃষ্টানদিগের সংস্পর্শে থাকিতে পারিব না। দোহাই আপনাদের, আমাকে ঘরে পাঠাইয়া দিন।

রমণী বহু ক্রন্দন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা আশান্বিত হইয়া শেষে এই বলিয়া হইলেন, 'আপনি দুই একদিন এইখানে থাকিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে আপনি কেমন উৎকৃষ্ট সমাজে আসিয়াছেন। এক্ষণে যাহার জন্য অনুতপ্ত, পশ্চাৎ তাহারই জন্য কতই তৃপ্তি লাভ করিবেন।'

রমণী যখন দেখিলেন তথা হইতে তাঁহার নির্গমনের আর কোন আশা নেই, তখন তিনি স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আমাকে তোমরা কিরূপে রক্ষা করিবে কর, আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করিব।' এই বলিয়া তিনি অন্নজল ত্যাগ করিলেন।

স্বামী ও মিশনারিগণ ভাবিলেন, নবাগত রমণীর প্রথম শোক তিরোহিত হইলে

পরে সহজে আহারাদি করাইতে পারিবেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহাকে তৎকালের জন্য উপেক্ষা করিলেন।

এক গোয়ালানী ঐ আড্ডায় দুগ্ধ যোগইত। সে এই নবাগত রমণীর দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অবসর পাইবামাত্র পরামর্শ দিল, 'দেখ মা, এই বারুইপুরে রায়চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণ বাস করেন, তাঁহাদের অতুল প্রভাব, যদি তাঁহাদের শরণ লইতে পার বোধ হয় ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার। তাঁহাদের বাটী ঐ দেখা যাইতেছে। তুমি পুষ্করিণীতে হাত-মুখ ধুইবার ছল করিয়া আমার সহিত বাহির হইলে আমি পথ দেখাইয়া দিব। তুমি উর্দ্ধশাসে জমিদারদিগের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবারে কর্ত্রীমার কাছে গিয়ে তাঁহার শরণাগত হইলে আর তোমার কোন ভাবনা থাকিবে না।'

গোয়ালানীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া রমণী কুন্তল বাঁধিলেন ও সাহসে ভর করিয়া গোয়ালানীর নির্দ্দেশানুরূপে জমিদারদিগের বাটীর অভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। গোয়ালানী যখন দেখিল রমণী জমিদার বাবুদের বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন চিৎকার করিয়া গোয়ালানী মিশনারীদিগকে সংবাদ দিল, 'ওগো তোমাদের এখানে যে নতুন মেয়েটি এসেছিল সে ঐ দেখ দৌড়িয়া পালাইতেছে।'

এই সংবাদ পাইবামাত্র খৃষ্টানগণ রমণীকে ধরিতে ছুটিল। তাঁহারা নিকটে না যাইতে যাইতে উক্ত ললনা, উপবাসে দুর্ব্বল দেহে জমিদারের অন্দর গৃহে প্রবেশ করিয়া একেবারে কর্ত্রীমাতার চরণ ধরিয়া ফেলিলেন এবং 'ওমা, আমায় রক্ষা কর, আমাকে যাহাতে খৃষ্টান না করিতে পারে তাহার উপায় কর। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়াও আপনার চরণ ধরিয়াছি, আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে।' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কর্ত্রীমাতা, 'বাছা, তোমার কোন ভয় নাই। তোমাকে রক্ষা করিতে যদি আমাকে সর্ব্বস্বান্তও হইতে হয় তাহাও করিব', বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। রমণী যেন জীবন পাইলেন।

খৃষ্টানগণ যখন দেখিলেন রমণী অন্দরে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা নিবৃত্ত হইয়া, বড় জমিদার বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, আমাদের একটি মেয়ে আপনার অন্দরে প্রবেশ করিয়া বোধ হয় আপনার মা-

ঠাকুরাণীর আশ্রয় লইয়াছেন। আপনি আপনার মাতাকে বুঝাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলুন। অন্যথা সাহেবগণ আপনার নামে সালিস করিয়া আপনাকে বিপন্ন করিবেন।

বড় জমিদার বাবু ভাবিলেন, স্ত্রী স্বামীর নিকট থাকিয়া যাহা করুক না কেন আমার এ মিছে দায়ে থাকিয়া সাহেবদিগের বিরাগভাজন হইবার প্রয়োজন কি? স্বামী স্ত্রীকে লইয়া খৃষ্টান করুক আর হিন্দুই করুক তাহাতে আমার কি? ইত্যাদি ভাবিয়া মাতার নিকট যাইলেন ও 'সাহেবদের সহিত ঝগড়ায় পারিব না, বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ এক জাতীয়, তিনি নিজের জাতীর দিকে যত টানিবেন তত কি আমার দিকে টানিবেন? শেষে কি মা, স্বামীর অনুবর্তিনী নন তাঁহার জন্য আমাদিগকে কেন বিপন্ন করিবে? ইহাতে আমাদের পুণ্য না হইয়া পাপ হইবে', ইত্যাদি বলিয়াও যখন মাতাকে রাজি করিতে পারিলেন না, তখন জোর করিয়া রমণীকে খৃষ্টানদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

মাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই কার্য্যে হতাশ হইয়া, কনিষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ রায়চৌধুরীর নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন 'বৎস, তুমি আসিয়া আমার শরণাগত এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে যতক্ষণ খৃষ্টানদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ না করিতেছ, ততক্ষণ আমি অন্ন-জল স্পর্শও করিব না, তুমি আসিয়া মাতৃজীবন রক্ষা কর।'।

রাজবল্লভ রায়চৌধুরী সে দিন কলিকাতায় বেলিয়াঘাটায় অবস্থান করিতেছিলেন। বেলিয়াঘাটা বারুইপুর হইতে প্রায় ১৭ মাইল। বেলিয়াঘাটায় লোক গিয়া উপস্থিত হইল। রাজবল্লভ রায়ও সমস্ত অবগত হইয়া তৎক্ষনাৎ শকটারোহণে বারুইপুর যাত্রা করিলেন। তখন রেলওয়ের পথ হয় নাই।

বারুইপুরে উপস্থিত হইয়া আগে মাতার চরণ পূজা করিলেন ও তাঁহার আজ্ঞা লইয়া অসংখ্য লেঠেল সহিত খৃষ্টানদিগের ভবনে উপস্থিত হইলেন ও যে গৃহে ব্রাহ্মণ রমণী অবস্থান করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া লালনাকে পাল্কীতে উঠিতে বলিলেন। রমণী, আনন্দে গদগদ স্বরে বলিলেন, 'বাবা, তুমি যেমন অসহায়কে রক্ষা করিলে, ভগবান সেইরূপ তোমার মঙ্গল করিবেন', বলিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। পাল্কী আসিয়া জমিদারের অন্দরে লাগিল। রমণী আশ্রয় পাইয়া বাঁচিলেন। লেঠেলগণ যে ঘরে রমণী ছিলেন, সেই ঘরের সমস্ত দ্রব্য নিকটস্থ একটি ডোবায় ফেলিয়া দিল। খাট, টেবিল, চেয়ার, ঝাড়, লণ্ঠন, আয়না যাহা কিছু ছিল সমস্ত জলে ফেলিয়া দিয়া আপনাদের ক্রোধ শান্ত করিল।

রাজবল্লভ রায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি ভ্রাতাকে বিশেষ তিরস্কার করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন 'তোমার এই অবিবেচনার কার্য্যের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে।' তখন রাজবল্লভ রায় করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, দাদা, কি মায়ের আশীর্ব্বাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন না? তিনি যখন অভয় দিয়াছেন, তখন আমাদের অমঙ্গল হইতেই পারে না। আপনি দেখিবেন আমাদের সমস্ত আপদ্ দক্ষিণ বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় কোথায় উড়িয়া যাইবে।

মিশনারি সাহেবরা ক্রোধে আকুল হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অভিযোগ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে তদারকি করিতে আসিলেন।

যে গৃহে রমণী ছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, সেই গৃহে কিছুই নাই, সমস্ত জলশায়ি হইয়াছে। জল হইতে সমস্ত জিনিস তোলা হইল, একটি দ্রব্যও ভাঙ্গে নাই। তিনি এ দিক ওদিক চাহিতে চাহিতে গৃহের কোণে একটি শয্যা গুটান আছে দেখিলেন। এই শয্যাটি, রমণী খৃষ্টানদিগের শয্যায় শুইবেন না বলিয়া নিজে গুটাইয়া কোণে রাখিয়াছিলেন। লেঠেলরা ঐ শয্যাটি জলে ফেলিয়া দিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবিলেন, যে সমস্ত দ্রব্য জলে ফেলিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবল তাহাই জলে ফেলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা জমিদারের লোকের কাজ নয়, মিশনারিদিগের ভৃত্যেরাই নালিশ পাকাইবার জন্যই নিজেরা সন্তর্পণে জিনিসগুলি জলসাৎ করিয়াছে। ইহা সাজানো মকর্দ্দমা। এইরূপ বিশ্বাস হওয়াতে ম্যাজিষ্ট্রেট মকর্দ্দমা নামঞ্জুর করিলেন ও পাল্কী করিয়া উক্ত রমণীকে তাঁহার পিতার আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। মাতৃ আশীর্ব্বাদ সফল হইল।

এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক অমর কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর মত হল ..... রাজবল্লভ রায় সেদিন যদি 'পাদ্রীদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা না করতেন, তাহলে আরও কত যে অনর্থ ঘটতো, তা কে জানে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মধ্যে খুব সম্ভবত এটাই হল প্রথম দুষ্ট ইংরেজদের লাঞ্ছনার ঘটনা।'

রাজবল্লভ রায় সম্ভবতঃ বারুইপুর রাসমাঠের উত্ত দিকে ১৮১০ সালের মধ্যে প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যার নাম দেন 'রাজবল্লভ ভবন'। এই ভবনের ভিতর দুর্গাদালান, আনন্দময়ী মন্দির ও ভোগের ঘর, রাধাকান্ত ঠাকুরের মন্দির নির্মাণ করেন এবং বাড়ীর সামনে একটি পুকুর খনন করেন। উক্ত পুকুর খনন কালে একটি কোশাকুশি ও কালো পাথর পান। সেই পাথর আজ অবধি রাসমাঠের উত্তর দিকে গোলপোষ্টের পিছনে আছে।

এরপর দেখতে পাই বাংলা নব জাগরণের আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ সালে বিলেত যাত্রার সময় বাংলার জমিদারদের তরফ থেকে পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য যে আবেদন পত্র নিয়ে যান তাতে রাজবল্লভ রায়ের স্বাক্ষর আছে। রাজবল্লভ রায় তার বাড়ীতে দুর্গাপূজা, বাড়ীর সামনে রাসযাত্রা উপলক্ষে মেলা ও রথের মেলা ও চরকের মেলা করেন। তিনি দোলতলা দোল উৎসবও করান। কিন্তু দোলমঞ্চটি স্থাপিত হয় ১৩৭৩ শকাব্দে। ১৪৫১ শকাব্দ কে বা কারা করলো? এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। রাজবল্লভ রায়ের সময় জমিদারির সীমানা নিয়ে বড়িষার সাবর্ণ্য চৌধূরীদের সাথে বিরোধ হয় এবং সেই বিরোধের সমাপ্তি হয় উভয় পক্ষের লাঠিয়ালের সম্মুখ যুদ্ধে। সাবর্ণ্য চৌধূরীদের লাঠিয়ালদের সর্দারের নাম ছিল ভুগুরাম। রায়চৌধূরীদের পক্ষে লাঠিয়ালরা তলোয়ার দিয়ে ভুগুরামের শিরচ্ছেদ করেন এবং অবশেষে তাঁদেরই জয় হয়। ঘটনাটি ঘটে চৈত্র মাসের গাজনের আগের দিন। ভুগুরামের সেই কাটা মুণ্ডের কেশ আজও নাকি বংশ পরম্পরায় রক্ষিত আছে এবং বারুইপুরের গাজন উৎসবের সময় ভুগুরামের সেই কেশ উৎসব অঙ্গনে না আনলে গাজন শুরু হয় না, চড়ক ও গাজন এখনো হয়। বিনয় ঘোষ তাঁর পুস্তকে এইরূপ বর্ণনা করেছেন।

রাজবল্লভ রায়-এর ছয় পুত্র, প্রথম রাজকিশোর তার পুত্র রাজকুমার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনের পক্ষে স্বাক্ষর করেছিলেন (১৮৬৬ সালে)। তার খুল্লতাত ভ্রাতাদের মধ্যে শ্যামাচরণ, উমেশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, সূর্যকুমার, যাদবকুমার, ক্ষেত্রমোহন, কেদারনাথ, আনন্দকুমার, ঠাকুরদাস, কালীকুমার, বসন্তকুমার, ভবানীকুমার, গোবিন্দকুমার ও মাধবকুমারের সহায়তায় তিনি ১৮৫৮ সালে বারুইপুর হাইস্কুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৬৮ সালে প্রেসিডেন্সী কমিশানার বারুইপুরে ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -এর অনুরোধে একটি টাউন কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি গঠিত হয় ৩ জন জমিদার যথাক্রমে বাবু রাজকুমার রায়চৌধুরী, ঠাকুরদাস রায়চৌধুরী, আনন্দ কুমার রায়চৌধুরী, ডাঃ মহেশ চন্দ্র ঘোষ ও প্রধান শিক্ষক বিষ্ণু চন্দ্র মিত্রকে নিয়ে। (ফাইল ৬৫ / আরকাইভ বাঃ পৌঃ)

১৮৬৯ সালের ২২শে মার্চ প্রথম বারুইপুর পৌরসভার পৌরবোর্ড গঠন হয়। রাজকুমার রায়চৌধুরী, ঠাকুরদাস রায়চৌধুরী, আনন্দ কুমার রায়চৌধুরী, বিষ্ণু চন্দ্র মিত্র, ডাঃ মহেশ চন্দ্র ঘোষ, প্রসন্ন কুমার ব্যানার্জী, কাশীনাথ ব্যানার্জী ও মুনসেফ হরিনারায়ণ রায় - কে নিয়ে। (ফাইল এম.৩এ/২/৪ - আরকাইভ)।

১৮৬০ সালের কাছাকাছি রাজকুমার রায়চৌধুরী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছ থেকে কিনে নেন নীল কুঠীটি, ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুরের মহকুমা শাসক ছিলেন। ১৮৬৫ সালে তিনি রাজকুমার রায়চৌধুরীর বাড়ীতে বসে দুর্গেশনন্দিনী রচনা করেন এবং ১৮৬৬ সালে কপাল কুণ্ডলা রচনা করেন। 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' অথবা 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ', এই রমণীয় কাব্যকথা রায়চৌধুরী বাড়ীর ইট, কাঠ প্রথম নীরবে শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। বঙ্কিম বাবুর কোর্টে ব্যারিস্টার কবি মধুসুদন দত্ত সাওয়াল করেছেন।

রাজকুমার রায়চৌধুরীর সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের কতটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল তা জয়নগর নিবাসী কালীনাথ দত্ত ১৩০৬ সালে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রদীপ পত্রিকায় প্রকাশিত করেছিলেন তা হুবহু তুলে দিলাম।

একদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ বৃষ্টি অল্পক্ষণের জন্য থামিয়া গেল। কিন্তু থামিতে না থামিতে ভয়ঙ্কর শব্দে একটি বজ্রপাত হইল। তাহার ৪/৫ মিনিট পরে একটি লোক দৌড়িয়া আসিয়া কাছারীতে সংবাদ দেয় রাজকুমার রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র বজ্রাঘাতে গতায়ু হইয়াছে। শুনিবা মাত্র বঙ্কিম বাবু কাছারীর সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া রাজকুমার বাবুর বাটীর দিকে ধাবমান হইলেন। আমিও তাঁহাকেঅনুগমন করিলাম। আমরা বজ্রাহতের বাটীতে গিয়া দেখিলাম ..... টিনের ঘরে তিনটি লোক একটি মাদুরে দেওয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া কি গল্প করিতেছিল। প্রধান

বজ্রাহত মধ্যস্থলে ছিল। সেই বেচারাই তখন মৃত্যুমুখে পড়ে। ...... রাজকুমার বাবুর পরিবার মৃত পুত্রের মস্তক স্বীয় অঙ্কে গ্রহন করিয়া সেই গরের মধ্য স্থানে মুখাবৃতা হইয়া মৃতের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। রাজকুমার বাবু সেদিন রাতের ট্রেনে কলিকাতায় গিয়াছেন। ...... অমরা বজ্রাহত বাটীতে উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই নিকটস্থ পাদরি সাহেব সেখানে অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবু অবিলম্বে তাঁহাকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষকে আনিবার জন্য রামনগরে প্রেরণ করিলেন এবং কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য বিজ্ঞাপন করিয়া টেলিগ্রাম করিলেন। এদিকে ডাক্তার মহেশ ঘোষ উপস্থিত হইয়া ঘরের মধ্যে যুবকটির চৈতন্যোদয়ের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বঙ্কিম বাবুও ডাক্তারের সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কোন চেষ্টা সফল হইল না। রাজকুমারের পুত্র দেবেন্দ্র - এর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় ছিল। বড় কুটির পিছনে আদিগঙ্গার সহিত যোগাযোগ রক্ষাকারি খালে নৌকা বাইতেন তরুন নরেন্দ্র নাথ দত্ত। তাঁর এক ভগ্নির বিবাহ হয়েছিল - বারুইপুর মিত্র পরিবারে, দেবেন্দ্র পুত্র বিনীনেন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়েছিল শ্রী রামকৃষ্ণ ভক্ত বলরাম বসুর অপূর্ব সুন্দরী কন্যা কৃষ্ণময়ীর।

বারুইপুর রায়চৌধূরী পরিবার ও আনন্দময়ী দেবী

১৮১০ সালে রাজবল্লভ রায় বারুইপুর রাসমাঠের উত্তর দিকে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এবং রাজপুর থেকে চলে আসার সময়ে মা আনন্দময়ী (কালীকা দেবী) ও কৃষ্ণকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। রাধাকে রাজপুরে রেখে আসেন। রাজবল্লভ তার নির্মিত প্রাসাদের নাম দেন 'রাজবল্লভ ভবন'। এই বাটির মধ্যেই আনন্দময়ীর মন্দির নির্মাণ করেন, ঠাকুর বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ করেন। ইনি মহন্ত আনন্দ গিরিকে দিয়ে আনন্দময়ী মাকে নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করান। বর্তমান মন্দিরের পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে আনন্দগিরি সাধন ভজন করতেন। তার সমাধির উপর মায়ের মূর্তিটি রাখা আছে। তার নির্দেশিত গুপ্ত মতে মায়ের পূজা হয়। প্রতি আমাবস্যায় ছাগ বলি দেওয়া হয়। রাজবল্লভের ছয় পুত্র- রাজকিশোর, সদানন্দ, নিত্যানন্দ, পরমানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও রসিকানন্দ। বংশধরেরা ২ মাস করে

মায়ের সেবাইত নিয়োজিত হন। পরবর্তী সময়ে অনেক বংশধরেরা তাদের জমিদারী ও মায়ের পালার অংশ বিক্রয় করিয়া দেন অন্যান্য শরিকগণকে। এই দেবীর প্রথম পুরোহিত ছিলেন, মেদনীপুর জেলার ক্ষেপুৎ গ্রামের চক্রবর্ত্তী 'কাশ্যপ' গোত্রজ। বারুইপুরের রায়চৌধুরীবাবুরা ইহাদের 'কালীপূজা' করবার জন্য এখানে লইয়া আসেন, উল্লেখযোগ্য যে - ক্ষেপুৎ হইতে পাকুড়তলা গ্রামে আসিবার পর ইহাদের উপাধি পাঠক হয়। ইহাদের বারুইপুরে বহু জমিদান করেন, মায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য। আনন্দগিরি যখন বারুইপুরে আসেন, তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসেন বিশালাক্ষ্মী মায়ের মুর্ত্তি। ঐ মুর্ত্তিটিও তিনি রাজবল্লভ রায়কে দিয়ে রাজবল্লভ ভবনের অনতি দূরে প্রতিষ্ঠিত করান, ঐ মন্দিরের সামনেই তার ভৈরবী সমাধি আছে।

রাজবল্লভ রায় তার জমিদারী দেখতে একবার পেঁচাকুলি পরগণায় গিয়াছেন। সেই সময় বাড়ীতে কোন পুরুষ ছিল না। এই সুযোগে দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত দল রাজবল্লভ ভবনে ডাকাতি করতে আসে, কিন্তু 'মা' এসে প্রতি দরজায় ডাকাতগণকে দেখা দেন, যে প্রতি দরজায় 'মা' খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে। নিশীথ রাতে ডাকাতগণকে ডাকাতি থেকে বিরত হতে বলেন, জোর পূর্বক ডাকাত দল বাড়ীতে প্রবেশ করলে 'মা' নিজের হাতে ডাকাত দলকে হত্যা করেন। রাজবল্লভ রায়কে পেঁচাকুলিতে স্বপ্নাদেশ দেন এক্ষুনি বাড়ী ফিরে যেতে এবং নিহত ডাকাত দলকে তার হাঁড়ি কাঠের তলায় সমাধি দিতে ও আজ থেকে রাজবল্লভ ভবনের সমস্ত দরজা খোলা থাকবে, রাত্রিকালে কেহ কোনদিন অনিষ্ট করিতে পরিবেনা। সেই থেকে রাজবল্লভ ভবনের সদর দরজা খিড়কীর দরজাগুলি সব সময়ে খোলা থাকে।

মা আনন্দময়ী আবার স্থায়ী কয়েকজনকে মাতৃরূপে দর্শনও দিয়েছেন বারুইপুরের দক্ষিণ দিকে শাসন নামে গ্রাম আছে, একবার কার্ত্তিক মাসে এক গরীব চাষী তার ক্ষেতে কড়াই চাষ করেছিল। কিন্তু কয়েকদিন ধরে ছোট ছোট কড়াই গাছের ডগা কাটা অবস্থায় থাকে। কে কাটিতেছে তা দেখবার জন্য এক রাতে সেই চাষী ক্ষেতে জাগিয়া বসিয়া থাকে, মাঝ রাতে জ্যোৎস্নার আলোয় চাষী দেখে একটি ছোট মেয়ে গাছে ডগা কাটিতেছে, চাষী কে রে বলিয়া তাঁর পেছনে ছুটতে থাকে, শেষে মায়ের মন্দির অবধি আসিয়া আর মেয়েটিকে দেখতে পান না। চাষী বাড়ী

ফিরিয়া যায় এবং কাহাকেও কিছু বলেন না, রাত্রে মা চাষীকে স্বপ্নের মধ্যে বলেন আমি কচি কড়াই শাক আর ধান বনের চিংড়ি খেতে ভালোবাসি, আমাকে এরা তো দেয় না, তাই তোর ক্ষেত থেকে লইয়া আসি, সেই থেকে সেই চাষী পরিবার কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই মা-এর জন্য কচি কড়াই শাক ও ধান বনের চিংড়ি দিয়ে যাইত, এইরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী রায়চৌধুরী পরিবার ও স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ। এই আনন্দময়ী মা'র নামে রাজবল্লভ রায়চৌধুরী বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করে যান। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে শরিকি মামলা হয়। উক্ত মামলার কিছু দলিল থেকে হুবহু তুলে দিলাম।

বারুইপুরে শিক্ষার প্রসার ও রায়চৌধুরী পরিবার

রাজবল্লভ রায় রাজপুর থেকে বারুইপুরে এসে সংস্কৃত চর্চার জন্য বহু টোল প্রতিষ্ঠা করেন, জমিদারী থেকে প্রতিটি টোলের জন্য নিয়মিতভাবে বৃত্তি দেওয়া হত। বৃত্তির নাম 'চৌবাড়ী'। ১৮৫৮ সালে জানুয়ারী মাসে রাজকুমার রায়চৌধুরী তাহার পরিবারস্থ শ্যামাচরণ, উমেশ, গিরিশ, সূর্যকুমার, যাদবকুমার, ক্ষেত্রমোহন, কেদারনাথ, আনন্দকুমার, কালীকুমার, বসন্তকুমার, ভবানীকুমার প্রমুখের সহায়তায় বারুইপুর হাই ক্লাস ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই মাটির স্কুলটিতে পাঁচটি শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করা হয়, নানা পর্যায়ে এই বিদ্যালয়ে যাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও অর্থানুকুল্যে সম্ভবপর হয়েছে - তাদের মধ্যে ভূতপূর্ব সম্পাদক- ক্ষেত্রমোহন, কালিদাস, তারাদাস ও শৈলেন্দ্র (পচাবাবু) নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। রায়চৌধুরী জমিদারগণ বহু পরিমাণ ভূমি শিক্ষা প্রসারের কার্যে দান করেন, নামমাত্র ধার্য্য করও তারা কোনদিন গ্রহণ করেন নি। ঐ অর্থ থেকে প্রতি বৎসর যোগ্য ছাত্রদের সদানন্দ রায়চৌধূরী পারিতোষিক পুরস্কার বিতরণ করা হত। স্কুল সংলগ্ন পুস্করণিটি খনন করেন ভূতপূর্ব সম্পাদক কালিদাস রায়চৌধুরী। জলাশয় খনন করেন ভূতপূর্ব সম্পাদক কালিদাস রায়চৌধুরী। জলাশয় খনন করে ও ঘাট বাঁধিয়ে ছাত্রগণের পানীয় জলের অভাব দূর করেন। এই বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি প্রাপ্ত হন এই বংশের কালিদাস রায়চৌধুরী ১৮৮২, বিপিন্দ্র কুমার ১৮৮৬, নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী ১৯৩৩, জগৎ কিশোর ১৯৩৫ সালে।

যারা আজ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সম্পাদক হিসাবে

শিক্ষার প্রসারের সাথে যুক্ত ছিলেন, তারা হলেন (১) রাজকুমার (২) ঠাকুরদাস (৩) ক্ষেত্রমোহন (৪) কালীদাস (৫) শৈলেন্দ্রকুমার (পচাবাবু) (৬) সজলকুমার। পরিচালক সমিতির সদস্য ও সভাপতি হিসাবে - (১) সূর্যকুমার (২) আনন্দকুমার (৩) বসন্তকুমার (৪) তারাদাস (৫) রাধানাথ (৬) মলিন কুমার (৭) সৌরেন্দ্র কুমার সুনামের সহিত স্কুল পরিচালনা করে গেছেন। স্কুল পরিচালক সমিতিতে না থেকেও এই বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য যার নাম স্মরণীয় হয়ে আছে তিনি হলেন নিরোধলাল রায়চৌধূরী (কানুবাবু)- (১২৫ বৎসরের স্মরনিকা থেকে)। ১৫০ বৎসরের বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন সভাপতি হন শক্তি রায়চৌধুরী (পৌরপ্রধান, বারুইপুর পৌরসভা)। স্কুলের প্রবেশ মুখে ১৫০ বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি প্রবেশ তোরণ বানিয়ে দেন এই সময়কার পৌরবোর্ড। সুদীর্ঘ ৬ বৎসর যাবৎ শক্তি রায়চৌধুরী পরিচালন সমিতির সহিত যুক্ত, বর্ত্তমানে তিনি স্কুলের সম্পাদক পদে আশিয়ান।

স্কুলের সাথে সাথে গ্রন্থাগারও শিক্ষার একটি অঙ্গ। তাই আমরা বারুইপুর সাধারণ পাঠাগার-এর নির্ম্মাণ ও তার ইতিহাসটা একটু দেখি। ২৭শে অক্টোবর ১৯৩৫ সালে আনন্দময়ী পাঠশালা পাঠাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৩৮ জন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সভা হয়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এই বংশের - নিহারলাল, নিশিথ।

রমেন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী তার বহিগৃহে বিনা ভাড়ায় প্রথম পাঠাগারটি চালু করার অনুমতি দেন। এই বংশের নিশিথ রায়চৌধূরী প্রথম কার্য্যকরী সমিতিতে সহঃ সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। এই বংশের অন্যতম বংশধর বারুইপুরের পৌরপ্রধান শৈলেন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী ৬ই আগস্ট ১৯৪৮ সালে ৯৯ বছরের লীজ হিসাবে যে জমি দেন সেখানে তিনি এই পাঠাগারের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৯৫০ খ্রীঃ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন । এই পাঠাগারটির সাথে যে মানুষটির নাম সর্বদা উচ্চারিত হইবে তিনি হলেন নিরোধলাল রায়চৌধূরী। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত পাঠাগারের সহিত যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে সজল কুমার রায়চৌধূরীর নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়। বারুইপুরের সর্বপ্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় আনন্দময়ী পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা ঁকালিদাস রায়চৌধুরী এবং শ্যামসুন্দর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন ঁকমলেন্দু রায়চৌধুরী।

নবজাগরণ ও বারুইপুর রায়চৌধুরী পরিবার

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ সালে বিলাত যাত্রার সময় বাংলার জমিদারদের তরফ থেকে পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য যে আবেদন পত্রটি নিয়ে যান তাতে রাজবল্লভ স্বাক্ষর করেছিলেন। ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ ছিল, হিন্দু ধর্মের নামে যারা হিন্দু ধর্মকে কুলষিত করে সতীদাহ প্রথার মত নিষ্ঠুর মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক প্রথা চালু করে ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মের কোথাও 'সতীদাহ প্রথার কথা লেখা নেই।' তিনি যুক্তি দিয়ে ধর্মীয় পুস্তকগুলি ব্যাখ্যা করেন, যুক্তি দিয়ে প্রথমে সমাজপতিদের কাছে ধর্মের নামে এই নিষ্ঠুরতা বন্ধ করতে বলেন, কিন্তু কেহ কর্ণপাত না করায় রামমোহনকেএকঘরে করেছিলেন। সেই অর্থে ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় বাংলার জমিদারদের কাছে একটি আবেদন পত্র দিয়ে আলোচনার জন্য ডাকলেন। সেই পত্রে রাজবল্লভ রায় স্বাক্ষর করলেন, রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৩১ সালে ৮ই এপ্রিলে আইন করে বন্ধ করা হল। বাংলার নব জাগরণ ইতিহাসে রামমোহন রায়-এর সমর্থক হবার জন্য রাজবল্লভ রায়ের স্বাক্ষরটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল।

বহু বিবাহ ছিল হিন্দু ধর্মের নামে আর এক সামাজিক অত্যাচার, কারণ একই ব্যক্তি অনেক বিবাহ করতো ধর্মের নামে, পরে সে মারা গেলে বিধবা নামে বাংলার গ্রামে গ্রামে মা-বোনেদের উপর সামাজিক অত্যাচার শুরু হতো, তাই ১৮৬৬ সালে দয়ার সাগর বিদ্যাসগর মহাশয় বহু বিবাহ রোধ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সেই আন্দোলনে বিদ্যাসাগর মহাশয়-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেছিলেন রাজকুমার রায়চৌধুরী।

জাতীয়তার উন্মেষে বারুইপুরের হিন্দু মেলা ও রায়চৌধুরী পরিবার

'স্বাজাতীয় দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধন' করার, অর্থাৎ স্বদেশ চিন্তার ঐক্য ও স্বাবলম্বনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুমেলার' উৎপত্তি। জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের পূর্বেকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইণ্ডিয়ান লিগ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ও হিন্দুমেলাই ছিল বাংলার তথা ভারতের জাতীয় চেতনা প্রকাশের সংগঠন। হিন্দুমেলার

সংগঠকদের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়, জাতীয় সংবাদপত্র, জাতীয় সংস্থা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। এই সংগঠনের পেছনে সেদিনের বাংলার শ্রেষ্ঠ যে সন্তানরা সমবেত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবগোপাল মিত্র, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথও কিশোর বয়সে হিন্দু মেলায় একজন উৎসাহী অংশগ্রহণকারী ছিলেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ও কেন্দ্রীভূত এই হিন্দুমেলার প্রসার প্রচেষ্টা ক্রমে গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হয় এই নব জাতীয় চেতনার ধারাকে গ্রামের কৃষক জনতার মধ্যে নিয়ে যাবার উদ্দেশেই এই প্রয়াস। নবগোপাল মিত্র গ্রামাঞ্চলের জাতীয় চিন্তাধারা প্রসারের প্রধান উৎসাহী ছিলেন। কেন্দ্রীয় হিন্দুমেলার ১৮৬৭ হতে ১৮৮০ পর্যন্ত ১৪টি অধিবেশন হয়। পঞ্চম মেলার পর ১৮৭১ সাল হতে তিনটি গ্রামে মেলা প্রবর্তিত হয়। বারুইপুর ছিল এমনি একটি গ্রাম। ১৮৭১ হতে ৭৪ পর্যন্ত মেলা এই গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। বারুইপুরকে মেলাস্থল বেছে নেবার কারণ ছিল .... 'চব্বিশ - পরগণা বঙ্গদেশের একটি প্রধান জেলা, ইহার উপরিভাগও বিস্তর, ইহা রাজধানীর সন্নিকটে। এই জিলার বসুমতি শস্যরত্নে চিরভূষিতা রহিয়াছেন। .... বারুইপুর এই জিলার মধ্যে একটি প্রধান এবং মেলার পীঠস্থান, কারণ এখানকার রাসপূর্ণিমার মেলা সাধারণ মেলা নহে। সুতোরাং ইহা যে মেলার উপযুক্ত স্থল তাহা বলাবাহুল্য (মনোমোহন বসুর ভাষণ হতে)। প্রথম হিন্দু মেলার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায়, সোম প্রকাশ পত্রিকায় তা হুবহু তুলে দেওয়া হল।

সোম প্রকাশ,

২২শে ফাল্গুন, ১৮৭২, ৪ঠা মার্চ

জেলা ২৪ পরগণার অধীন বারুইপুর নামক গ্রামে মহা সমারহে জাতীয় হিন্দুমেলা ফাল্গুন সংক্রান্তি হইতে তিন দিবসের জন্য হইবেক তজ্জন্য সর্ব্ব প্রকার ব্যবসায়িদিগকে অবগত করা যাইতেছে, যে যে প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া আসিবেক তাহা সমুদায়েই বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা।

১২৭৮ সাল, ১০ই ফাল্গুন,

শ্রী নবগোপাল বসু
মেলার সহকারী সম্পাদক

এই মেলা প্রসঙ্গে সোম প্রকাশ পত্রিকায় ৬ই চৈত্র, ১২৭৮ বঙ্গাব্দে যে সংবাদ পরিবেশন হয়েছিল তা হল)—

গত ৩০শে ফাল্গুন অবধি ২রা চৈত্র পর্যন্ত বারুইপুরস্থ চৌধুরী বাবুদিগের বাটীর সম্মুখে মাঠে মহাসমারোহে একটি জাতীয় হিন্দু মেলা হইয়া গিয়াছে, মেলা স্থলে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে দর্শনীয় কিছুই ছিল না। শিল্পজাত দ্রব্য যাহা কিছু ছিল তাহা নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। মেলাস্থলে প্রায় ১০ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। বিদ্যালয়ের যে সব ছাত্রগণের লেখা ও অপরাপর ব্যক্তিদিগের বক্তৃতা বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশের মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা কৃষক ও অন্যান্য ভদ্রলোক মাত্রই বিশেষ সন্তুষ্ট হন, এটি স্থায়ী হইলে এদেশের যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। চৌধূরী বাবুরা উপস্থিত ভদ্রলোক মাত্রেরই প্রতি বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করাতে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১২৭১ সনে অধ্যক্ষ কর্তৃক একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

সোমপ্রকাশ

'বিজ্ঞাপন'

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুর নামক পল্লীর মধ্যে জাতীয় হিন্দুমেলা আগামী ২৫শে ফাল্গুন হইতে তিন দিবসের নিমিত্তে অতি সমারোহে উক্ত স্থানের জমিদার বাবুদিগের বাটীর সম্মুখস্থ মাঠে হইবে। তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ীদিগকে অবগত করা যাইতেছে, যে যে প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া আসিবে তৎসমুদায় বিক্রয় হইয়া যথেষ্ট লভ্য হইবে এবং যাহার আনীত দ্রব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বারুইপুর শ্রী রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী

৫ই ফাল্গুন, ১২৭৯

কার্য্যাধক্ষ

এই মেলা প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় ২৮শে ফাল্গুন, ১২৭৯ সালে যে সংবাদ পরিবেশন হয়েছিল তা হল -

সাধারণ বিজ্ঞাপন অনুসারে গত ২৫, ২৬, ২৭শে ফাল্গুন তিন দিবস বারুইপুরে হিন্দু মেলা সমারোহে সমাধা হইয়া গিয়াছে। এই ইহার তৃতীয় ষান্মাৎসরিক

অধিবেশন, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে অত্যন্ত পুরাতন জমিদার বাটীর কয়েকটি উৎসাহী পুরুষ এই কার্য্যে বিশেষ উৎযোগী হইয়া মেলা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন কিন্তু এ বৎসর তাঁহাদের সে প্রকার ভাবের অভাব দেখিয়া অত্রস্থ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী মহাশয় নিজে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য এবং বিবিধ চেষ্টার দ্বারা উক্ত তিন দিবস মেলার কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। তিন দিবসই সাধারণের দর্শনোপযোগী অনেক ব্যাপার হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে হিন্দু জাতির স্ত্রী ও পুরুষ সংরচিত বিবিধ ও সুচারু সম্পন্ন শিল্প দ্রব্য সংগ্রহীত ও প্রদর্শিত ও নানা প্রকার সাধারণ ও চমৎকার কৃষিজাত দ্রব্যজাত মেলা স্থানে আনীত হইয়া তৎ সমুদায়ের রচয়িতা ও উৎপাদনকারী দিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। কতকগুলি বাঙ্গালী যুবক চমৎকার রূপে ব্যায়াম কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সাধারণ-এর বিশেষ প্রীতি ও প্রশংসা পাত্র হইয়াছে। রাঁয় ব্যাঁস নামে এক প্রকার দেশীয় ব্যায়াম হয়েছিল। মেলাস্থলে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য দেশীয় অসামান্য কবিত্ব শক্তির ও সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল সঙ্গীত হইয়াছিল তাহার এক একটিতে ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের মিথ্যা ঘোষণা বিরুদ্ধে বাক্য বিন্যস্ত থাকাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, শুনিলাম মেলার অধ্যক্ষ মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে এই কার্য্য হইয়াছে, আশাকরি যে ভবিষ্যতে ঐ সাম্প্রদায়িক ও অনুদার ভাব এখানে স্থান পাইবে না, শেষ দিবসে আলিপুরের শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অশ্বারোহণে মেলা স্থলে উপস্থিত হইয়া উৎসাহ দান ও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক মেলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বিশেষ ফলোপধারী ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। আমরা আশা করি রাজেন্দ্র বাবু সমধিক উৎসাহ ও যত্নের সহিত উক্ত প্রকার বিবিধ সদনুষ্ঠানের দ্বারা দেশের কল্যাণ বিধান করুন, ঈশ্বর তাঁহার সাধু ইচ্ছার সুফল প্রদান করিয়া দক্ষিণাঞ্চলকে উজ্জ্বল করুন।

সন্দেহ নেই শ্রেণী চিন্তা, দ্বিধা এ দোদুল্যমানতা এখানে ছিল। এসব সত্ত্বেও বারুইপুর হিন্দুমেলা সেদিন প্রথম ভারতের গ্রামাঞ্চলে পরবশ্যতার বিরুদ্ধে চিন্তা চেতনা নিয়ে এসেছিল। স্বাবলম্বনের কথা বলেছিল, শ্রমজীবি কৃষক বুদ্ধিজীবির জাতীয় ঐক্যের কথা তুলেছিল। এই সব কারণেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের

ইতিহাসে বারুইপুর হিন্দুমেলা ছিল একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও গৌরবজনক ঘটনা) যা আমাদের অপুরনীয় কর্তব্য পূরণে উদ্বুদ্ধ করে।

বারুইপুর হিন্দুমেলা ১৮৭২ খ্রীঃ মনোমোহন বসুর ভাষণ হতে এই মেলার উৎকৃষ্টা দেবীর সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

এই মেলা রাধাকৃষ্ণের উৎসবের জন্য নয়, গঙ্গার উদ্দেশ্যেও নয় পীরের মহিমাসূচকও নয় এই মেলার উদ্দিষ্ট দেবী তন্ত্রোক্তা নন পুরোণাক্তা নন। ইহার নাম 'উন্নতি'। উন্নতি দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্যই তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবার জন্যই এই মেলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শারদীয়া মহাদেবীর ন্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভূজা! তাঁহারও দশহস্তে দশবিধ অস্ত্র আছে - প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যানতত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা, অষ্টমে সমাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য। 'উদ্যম' নাম সিংহের পৃষ্ঠে আরুঢ়া হইয়া উন্নতি দেবী এই সব অস্ত্র বিশেষতঃ শেষোক্ত ভল্লদ্বারা দৈত্যপতি 'পরবশ্যতার' বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন। অনুরূপভাবে স্বদেশীয় জাতীয়তাবাদের অংশগ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ সারা দেশের যখন বিদেশীয় দ্রব্যের ত্যাগের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল তখনও বারুইপুর রায়চৌধূরী পরিবারে শ্রী দুর্গাদাস রায়চৌধূরীর আহ্বানে দেশমাতৃকার মুক্তি সাধন ও স্বদেশী শিল্পের ব্যবহারের জন্য ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১০ই আশ্বিন (১৯০৫ খ্রীঃ) বারুইপুরে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। (যাহা রামনগর নিবাসী শ্রী অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তীর নিকটআছে। এই পত্রটির ফটো কপি দেবার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ)। ঐ সভায় আমন্ত্রণ পত্রটি হুবহু তুলে দিলাম।

/বন্দে মাতরম্*

মহাশয়,

বিদেশীয় দ্রব্যের যথাসম্ভব ব্যবহার ত্যাগ ও স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রচুর ব্যবহার এবং স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি-সাধন উদ্দেশ্যে আগামী ১৫ই আশ্বিন রবিবার অপরহ্ণে ৪ চারি ঘটিকার সময়, বারুইপুর গ্রামে আমাদিগের 'রাসমাঠে', একটি মহতী সভার অধিবেশন হইবে। সভাস্থলে বঙ্গের সুকৃতি-সন্তান বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু ভুপেন্দ্রনাথ বসু ও কলিকাতার কতিপয় মহাত্মার আগমন হইবে। উক্ত সভায় মহাশয়দিগের আগমন ও সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বারুইপুর,
সন ১৩১২ সাল
১০ই আশ্বিন

একান্ত বশম্বদ,
শ্রী দুর্গাদাস রায় চৌধুরী

খেলাধূলার প্রসারে রায়চৌধূরী পরিবার

দঃ ২৪ পরগণা জেলার সংগঠিত খেলার ইতিহাস শুরু ফুটবল দিয়ে, যা বংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। আর এই খালাটি প্রথম শুরু হয় বারুইপুরে, ১৮৯৮ স্যালে রায়চৌধূরী স্পোটিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠার সময়ে। ১৫ জন সদস্য নিয়ে যে ক্লাবের যাত্রা শুরু, ১৯১৫-১৬ সালে সভ্য সংখ্যা প্রায় দইশত। প্রথম সদস্যদের নাম না পাওয়া গেলেও ১৯১৫ সালে যুক্ত সকলের নাম জানা যায়। সেই সময়ে সম্পাদক ছিলেন - নন্দলাল রায়চৌধূরী, শৈলেন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী, বি.এ., যতীন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী, সভাপতি ছিলেন এম. ডাব্লু. গোনদা, আই.সি.এ., বার্ষিক খরচ ছিল) ৪৪৬ টাকা ৮ আনা। এই সময়ে হরিপ্রিয়া শীল্ড, দুর্গাদাস কাপ, ন্যালেন মেডেল প্রতিযোগিতা চলত। সবগুলি প্রতিযোগিতা সরাসরি আই.এফ.এ. অনুমোদিত ছিল। এই প্রতিযোগিতার পরিচালনা করতেন ক্রেটন, ম্যাকব্রাইট, ড্রিল কোট, গ্রেষ্টন প্রমুখ আন্তর্জাতিক পরিচালক বৃন্দ। এই সকল প্রতিযোগিতায় ক্লাবের মাঠে মোহনবাগানের বিখ্যাত ভাদুরী ভ্রাতৃদয়, সুধীর চ্যাটার্জী, দুখিরাম বাবুর মত স্বনামখ্যাত খেলোয়াররা খেলে গেছেন। পরবর্তী সময়ের রাজবল্লভ চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও সুশীল ও সুনীল চ্যালেঞ্চ কাপ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, যাহা দঃ ২৪ পরগণা জেলা ক্রিড়া সংঘের অনুমোদিত। এই সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন মঙ্গল পুরকায়েস্ত, পি. রায়চৌধূরী, জহর দাস, অপু ঠাকুর, অশোকলাল ব্যানার্জী, সুশীল সিংহ, প্রতাপ ঘোষ, অতনু ব্যানার্জী প্রমুখ আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন খেলোয়াড় বৃন্দ। রায়চৌধূরী পরিবারের অলোক রায়চৌধূরী, কৃষ্ণলাল রায়চৌধূরী কলিকাতার মাঠে সুনামের সাথে খেলেছেন। এই বংশের অধীর রায়চৌধুরী সারা ভারত গ্রামীন ফুটবল প্রতিযোগীতায় বাংলা

দলের হয়ে অংশগ্রহণ করেন। খেলাধুলা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে দঃ ২৪ পরগণার শ্রেষ্ঠ রেফারি হিসাবে মলিন রায়চৌধুরী নাম করতেই হয়। এই সঙ্গে সদস্য সুশীল কৃষ্ণ দত্তের নেতৃত্বে বারুইপুরে প্রথম দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা ক্রীড়া সংঘ গঠিত হয়। ২৪ পরগণা ক্রীড়া সংঘের অন্তর্ভুক্তও হয়। এই ক্রীড়া সংঘের ভবনটি নির্মাণ করতে তৎকালিন পৌরপ্রধান ও আর. সি. স্পোটিং ক্লাবের সভাপতি শৈলেন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী (পচাবাবু) পৌরসভার পক্ষ থেকে জমি লীজ দেন, পরবর্তী কালে ঐ বাড়ীটি নির্মাণ হয়। আজ যা জেলা ক্রীড়া সংঘ রূপে শোভা পাচ্ছে। শত বর্ষ পার হওয়া এমন একটি ক্রীড়া সংগঠন আছে দক্ষিণ ২৪ পরগণায়। যত দিন জেলা ক্রীড়া সংঘ থাকবে তত দিন দঃ ২৪পরগণার খেলাধূলার ক্ষেত্রে আর. সি. স্পোটিং ক্লাব ও রায়চৌধূরী পরিবারের শৈলেন্দ্র কুমার রায়চৌধূরীর স্বর্ণোজ্জ্বল নাম লেখা থাকবে। সম্প্রতিকালে সংঘ সভাপতি রবীন্দ্র কুমার রায়চৌধূরীর দান করা জমিতে 'অলোক ভবন' নির্মিত হয়েছে। বর্ত্তমান অলোক ভবনটি ক্লাবের কার্যকরি সমিতির সদস্য ও পৌরপ্রধান শক্তি রায়চৌধুরীর উদ্যোগে ও বর্ত্তমান রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় দু-দফায় প্রায় ৪ লক্ষ টাকা অনুদানে দ্বিতল গৃহটি নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। এলাকার বহু মানুষের আর্থিক ও অন্যান্য দানের মাধ্যমে শতবর্ষের এই ক্লাবটি শুরু থেকে আজ অবধি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সুনামের সাথে খেলে যাচ্ছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রায়চৌধূরী পরিবার

সাহিত্য সংস্কৃতিতেও বারুইপুর রায়চৌধূরী পরিবারের অবদান ছিল। এই বংশের অম্বিকা রায়চৌধূরী, মনমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। ডাঃ সমর রায়চৌধূরী চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখেছেন সেভিল এর ক্লিনিক্যাল মেডিসিন-৪টি খন্ড যা পশ্চিবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ পাবলিশ করেছেন, এছাড়াও ভারতীয় ভেষজ শিল্পে বহুজাতিক রাহুর দায়া, নামক পুস্তকটি একটি অনন্য সম্পদ। শচীন রায়চৌধূরীর লিখিত গ্রন্থটিও বারুইপুরের ইতিহাস নিয়ে যারা চর্চা করেন তাদের মধ্যে অমর কৃষ্ণ চক্রবর্তীর কাছে আছে। হাতে লেখা, মূল পুস্তকটির হদিস পাওয়া যায় না। এবং সাহিত্যে সংস্কৃতিতে সজল রায়চৌধূরী শুধু এই পরিবারের নয় এই প্রদেশেরও একটি উজ্জ্বল নাম। তার দুটো নাট্য

সংকলন, গণনাট্য কথা, নট, নাট্যকার, নির্দেশক বীজন ভট্টাচার্য, নাট্য নিয়ন্ত্রণ ১৮৭৫ গ্রন্থগুলি তাকে বাংলা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ করেছেন। এছাড়াও বহু পত্রিকায় তার প্রবন্ধগুলি বিদগ্ধ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি অভিনয় জগতে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। মৃগয়া চলচিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি পুরস্কৃত হন। বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গ গণনাট্য সংঘের বহু নাটকে অভিনয় করেন। তার সুযোগ্য পত্নী রেবা রায়চৌধূরীও একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ও সুলেখিকা। তার রচিত 'জীবনের টানে শিল্পে টান'। সজল রায়চৌধূরী সম্পাদিত সঙ্গম পত্রিকায় নিশিথ রায়চৌধূরীর কবিতাও পাওয়া যায়। এছাড়াও ললিত রায়চৌধুরী রচিত একটি প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, যাহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য সম্পদ।পরবর্তী কালে এই গ্রন্থের লেখকের সম্পাদিত পত্রিকার নাম আদি-গঙ্গা । যাহা ইতিমধ্যে বাংলা ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার সমাজে স্থান লাভ করে নিয়েছে। রায়চৌধুরী বাড়ি 'দুর্গাধামে' দক্ষিণ ২৪ পরগণা ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। লেখকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে প্রায় ৭০০ (সাত শত) পত্রিকা আছে যাহা দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য রাজবল্লভ ভবনের দ্বিতলে একটি থিয়েটার মঞ্চ ছিল, সেখানে প্রতি বছরে রাসের সময়ে রায়চৌধূরী পরিবারের সবাই অভিনয় করতেন। একবার এই মঞ্চে সাউথ গড়িয়ার বাসিন্দা বাংলার খ্যাতনামা অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় কর্ণার্জুন নাটক করেছিলেন, একটি মাত্র দৃশ্যে, বন্ধু অনিল রায়চৌধুরীর অনুরোধে।

বারুইপুর পৌরসভা ও রায়চৌধূরী পরিবার

বারুইপুর পৌরসভা পশ্চিমবঙ্গ তথা অবিভক্ত বাংলার অন্যতম প্রাচীন পৌরসভা। বারুইপুরের প্রাচীনতম সামাজিক সংগঠন এই পৌরসভা, বারুইপুর থানা ও নগর অতি সুপ্রাচীন। এর আয়ুস্কাল ১৩০ বৎসর পূর্ণ হল। দীর্ঘ এই সময় সারা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনেতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সাথে সাথে এই পৌর এলাকারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এক সময়ে যা ছিল বড় বড় ফলে গাছ-গাছালিতে ভরা তা এখন নতুন নতুন ঘর বাড়ীতে পূর্ণ এক নগরীতে পরিণত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে পা ফেলে আমরাও অনেক এগিয়ে

এসেছি। ১৮৬৮ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সী কমিশনার বারুইপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে একটি টাউন কমিটি গঠন করেন। টাউন কমিটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উক্ত কমিটি গঠিত হয় - রাজকুমার রায়চৌধূরী, ঠাকুরদাস রায়চৌধূরী, আনন্দকুমার রায়চৌধূরী, ডাঃ মহেশ ঘোষ ও প্রধান শিক্ষক বিষ্টু মিত্রকে নিয়ে। (ফাইল - ৬৫)

১৮৬৯ খ্রীঃ বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে বারুইপুর পৌরসভা গঠিত ও অনুমোদিত হয় ২২শে মার্চ। রাজকুমার রায়চৌধূরী পৌরপ্রধান, ঠাকুরদাস রায়চৌধূরী, আনন্দকুমার রায়চৌধূরী, বিষ্টুচন্দ্র মিত্র, ডাঃ মহেশ চন্দ্র ঘোষ, প্রসন্ন কুমার ব্যানার্জী, কাশীনাথ ব্যানার্জী ও মুনসেফ হরিনারায়ণ রায়। (ফাইল এম.৩এ/২৪)

বিভিন্ন সময়ে যারা পৌরপ্রধান হয়েছেন এই বংশের তারা হলেন

১) রাজকুমার রায়চৌধূরী	-	১৮৬৯
২) ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধূরী	-	১৮৯৪
৩) ব্রজেন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী	-	১৯০৩
৪) দুর্গাদাস রায়চৌধূরী	-	১৯০৪-১৯০৮
৫) শিবদাস রায়চৌধূরী	-	১৯১৮-১৯২৪
৬) শশিন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী	-	১৯৩৬-১৯৩৯
৭) শৈলেন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী	-	১৯৪০-১৯৫৬
৮) ললিত কুমার রায়চৌধূরী	-	১৯৬৮-১৯৭৮
৯) শক্তি রায়চৌধুরী	-	২০০৫- এখনো পর্যন্ত

বিভিন্ন সময়ে যারা উপ-পৌরপ্রধান ছিলেন

১) ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধূরী	-	১৮৯১-১৮৯৪
২) ব্রজেন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী	-	১৯০২
৩) হরিদাস রায়চৌধূরী	-	১৯১৬-১৯২০
৪) ললিত কুমার রায়চৌধূরী	-	১৯৬১-১৯৬৮

এছাড়া যারা বিভিন্ন সময়ে কমিশনার হয়েছিলেন তারা হলেন কালিদাস

রায়চৌধূরী, আনন্দ কুমার রায়চৌধূরী, ঠাকুরদাস রায়চৌধূরী, সুশীল কৃষ্ণ রায়চৌধূরী, অনিল কুমার রায়চৌধূরী, রমেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী, শৈলেন্দ্র কুমার রায়চৌধূরী, কমলেন্দু রায়চৌধুরী, নীরোদ লাল রায়চৌধূরী, শক্তি রায়চৌধূরী, উপরোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি আরকাইভ অফ্ ইণ্ডিয়া, জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত গেজেট গুলো থেকে। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে কিছু দুবৃত্তের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল এই পৌরগৃহ, ভস্মীভূত হয় পৌরসভার প্রাচীন মূল্যবান রেকর্ড পত্র। বারুইপুর পৌরসভার জন্য জমিদান করেছিলেন রাজকুমার রায়চৌধূরী, ১৯৩৯ সালে শশীন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী পৌরপ্রধান থাকাকালীন কুড়ে ঘর একতলা পাকা ঘরে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৯৭০ সালের পৌরপ্রধান ললিত রায়চৌধূরী সি.এম.ডি - এর সদস্য মনোনীত হন। ১৯৭৪ সালে পৌরসভা রবীন্দ্র- ভবন নির্মাণ করে, এই সময়ে নির্মিত বর্তমান পৌর ভবনটিও তৈরী হয়। ২০০৫ সাল থেকে অদ্য অবধি পৌরপ্রধান শক্তি রায়চৌধুরীর সময়ে নির্মিত হয় - পৌর শ্মশানঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি, বৃদ্ধাবাস, শিশু লাইব্রেরী, ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাতৃসদন ও হার্ট মনিটরিং সেন্টারের নির্মাণ, আধুনিক সুইমিং পুল, বারুইপুরের জমা জল নিষ্কাষণের জন্য বারুইপুর ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান তৈরী সহ বহু পীচ ও ইটের রাস্তা তৈরী ও সংস্কার, বাড়ি বাড়ি থেকে জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থা, পৌরসভার ১ বিঘা জমির উপর ডাম্পিং গ্রাউণ্ডটি ৬ বিঘা জমিতে সম্প্রসারিত করা ও তার আধুনিকীকরণ, সোয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল প্রকল্প, দুটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সভাকক্ষ ১টি পৌরসভায় এবং আপরটি রবীন্দ্রভবনে, বারুইপুর শহরের অধিকাংশ গরীব মানুষদের জন্য বাস্‌প প্রকল্পে দু-দফায় প্রায় দু-হাজার গৃহ নির্মাণ, পৌর এলাকায় জি.আই.এস. -এর কাজ সম্পূর্ণ করা, বেশ কয়েকটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, নতুন দুটি আধুনিক পৌর বাজার নির্মাণ করা, শহর সৌন্দর্য্যায়নের উদ্দেশ্যে কয়েকটি পার্ক নির্মাণ সহ আধুনিক আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা, পৌরসভার হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মিদের জন্য দুটি আবাসন নির্মাণ সহ আরও কয়েকটির কাজ শেষ হওয়ার পথে । এছাড়াও বর্তমান রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় খোদার বাজার, কল্যাণপুর, শাসন ও বংশীবটতলায় ব্রীজ নির্মাণ করা, পৌরবাসীদের বহু প্রতিক্ষিত ও কাঙ্খিত উড়ালপুল চালু করা, বারুইপুর

মহকুমা হাসপাতালে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কাজ শুরু করা সহ সাধারণ গরীব মানুষদের জন্য ন্যায্য মূল্যের ঔষধের দোকান ও বহু মূল্যবান সিটি স্ক্যান মেশিন চালু করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে কয়েকটি নতুন বাস রুট চালু করা (দীঘা, জঙ্গলমোহল, সল্টলেক, দক্ষিণেশ্বর, হাওড়া আরও কয়েকটি চালু হওয়ার পথে)। পৌরসভার আয়তন সেদিনও ছিল- ৭.৫০ বর্গমাইল, ওয়ার্ড ছিল ৬টি, হল ১১টি, বর্তমানে ১৭টি। পৌরসভা আয়তনে না বাড়লেও জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে প্রচুর, বর্তমানে এটি সাব-ডিভিশনাল পৌরসভা। বর্তমান পৌরপ্রধান শক্তি রায়চৌধুরীকে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে কে.এম.ডি.এ. -এর সদস্য মনোনিত করেন।

মেলা, পূজা পার্বন ও রায়চৌধূরী পরিবার

রাসযাত্রার মেলা ঃ

বারুইপুরে রাধাকৃষ্ণের রাসোৎসব উপলক্ষ্যে রায়চৌধূরী বাড়ীর সম্মুখে প্রায় ৮ বিঘা জমির উপর কার্ত্তিক পূর্ণিমা হইতে এক মাস ব্যাপী একটি মেলা বসে, মেলাটি প্রায় ১৭৯৫ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর রাজবল্লভ রায় বারুইপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর শুরু হয়। দুইশত বৎসরের অধিক। দঃ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন থানা থেকে এবং কলকাতা থেকে মেলার ত্রিশ সহস্রের অধিক নর-নারী যোগদান করিয়া থাকেন। প্রধানতঃ ট্রেন, বাস, ট্যাক্সী, অটো যোগে যাত্রীরা আসেন। মেলায় প্রায় ছয় শতাধিক দোকান পাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজানা আদায় কার হয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর পুতুল নাচ, কবিগান ও যাত্রা অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া তিনদিন ধরে রাধাকৃষ্ণকে সাজানো হয় ঃ- ১ম দিন রাখাল বেশে, ২য় দিন নটবর বেশে, ৩য় দিন রাজ বেশে। রাধাকৃষ্ণ যখন মূল মন্দির থেকে রাসমঞ্চে আসেন তখন আলোক সজ্জায় সজ্জিত হয় এবং বিভিন্ন প্রকার আতস বাজীর প্রদর্শন হয়। রাসমঞ্চে পূজা ও আরতির সময়েও আতস বাজী পোড়ানো হয়। বিশেষ করে পূজার পর সারা রাত ধরে আতস বাজীর প্রদর্শন হয়। যেমন - রকেট, কদমগাছ, সাপ বাজীর লড়াই, হাওয়াই বোম ও হাঁড়িবাজী পোড়ানো হয়। এর মধ্যে কদমগাছ আতস বাজীটি বেশ অভিনব। বাজী পোড়ানোর পর নাটক করতেন রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা নতুন স্টেজে, কিন্তু এখন নাটক হয় না। মঞ্চও নেই কিন্তু বাজী পোড়ে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদ হয়। রাস উপলক্ষে সারকাস খেলা হয়। বারুইপুরের রাসমেলা বাংলার একটি প্রাচীন মেলা।

রথ-এর মেলা ঃ-

বারুইপুরের রথ যাত্রার মেলার বিশেষ খ্যাতি আছে। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পনেরো দিন ব্যাপী এই মেলা বসে। মেলাটি দুইশত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। প্রায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে দশ সহস্র নর-নারীর সমাগম হয়।

চরক মেলা ঃ-

মূলত এই মেলাটি এখানে শুরু হয় বীরত্বের নির্দশন স্বরূপ। চৈত্র সংক্রান্তিতে চরক উৎসব উপলক্ষ্যে মেলায় প্রায় দশ সহস্র নর-নারীর সমাগম হয়। এই মেলাটি নিয়ে একটি কাহিনী আছে। যা হল - বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের সহিত জমিদারির সীমানা নিয়ে বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের সাথে একবার বিরোধ হয় এবং সেই বিরোধের সমাপ্তি হয় উভয় পক্ষের লাঠিয়ালদের সম্মুখ যুদ্ধে। সাবর্ণ চৌধূরীদের লাঠিয়ালদের সর্দারের নাম ছিল ভুগুরাম। রায়চৌধুরীদের পক্ষে লাঠিয়ালরা তলোয়ার দিয়ে ভুগুরামের শিরচ্ছেদ করেন এবং অবশেষে তাঁদেরই জয় হয়। ঘটনাটি ঘটে চৈত্র মাসের গাজনের আগের দিন। ভুগুরামের সেই কাটা মুণ্ডের কেশ আজও নাকি বংশ পরম্পরায় রক্ষিত আছে এবং বারুইপুরের গাজন উৎসবের সময় ভুগুরামের সেই কেশ উৎসব অঙ্গনে না আনলে গাজন শুরু হয় না। বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ ভুগুরামের কেশ আজও বারুইপুরের গাজন উৎসবের অঙ্গ হিসাবে অপরিহার্য হয়ে আছে। এই মেলা উপলক্ষ্যে জেলার প্রায় দুই শতাধিক বিক্রেতা দোকান পাট নিয়ে এখানে আসেন।

দক্ষিণ রায় মেলা ঃ-

বারুইপুর থানার মধ্যে ধপধপি গ্রামে পয়লা মাঘ জাঁতাল পূজা উপলক্ষে একটি মেলা হয়। দক্ষিণেশ্বরকে কেউ কেউ দক্ষিণ রায় বলে শুধু বাবা বালে ডাকে, ভক্তরা বাবার কাছে যা চাইবে তাহাই মিলবে। বাবা হলেন ধন্বন্তরি,

বাবার চরণামৃত, তেলপোড়া, জলপড়া, গাছ-গাছালির নিংড়োনো রস খেয়ে বা মালিশ করে অনেকেই ভাল হয়ে যায় বলেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার মানুষের বিশ্বাস। প্রতি শনি, মঙ্গলবার লোক ঔষধ নিতে, পূজা দিতে আসে এখানে। মাটির তৈরী মূর্তিটি দক্ষিণেশ্বরের আসল মূর্তি। বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধূরীদের জমিদারির মধ্যেই ছিল ধপধপি, তারাই দেবতার মন্দির তৈরী করে দিয়েছিল। অনেক দেবোত্তর জমিও তারা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিধন্য বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের দুর্গাপূজা।

ইতিহাসের পাতা উল্টে এই রায়চৌধুরী পরিবারের উদ্ভব কাহিনীতে জানা যায় - রায়চৌধুরী পরিবার বর্তমান দক্ষিণবঙ্গের আদিগঙ্গার সন্নিকটে রাজপুরে জঙ্গল কেটে গড়বেষ্টিত সুদৃঢ় বাড়ি তৈরী করে সেথায় বসতি শুরু করেন। পরে ভাগ্য প্রসন্ন হওয়ায় ঘুটিয়া শরিফের গাজিবাবার কৃপায় মেদনমল্ল পরগণার অধিকারী হন। তিনিই তদানীন্তন বঙ্গের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর নেকনজরে পড়ায় নবাব মদনমল্লকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পেঁচাকুলি পরগণা দান করেন, শুধু তাই নয়, নবাব তাকে 'রায়' উপাধিতেও ভূষিত করেন।

এরূপ বহু সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়ে জমিদার রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত মদন রায় মানসিক ঔদার্যে উৎফুল্ল হয়েই বাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু করেন। মহাধূমধামে সেই পূজা চলে আসার পর দীর্ঘদিন পরে ইংরেজদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোপে পড়ে ১৭৯৩ খ্রীঃ সেখানকার জমিদারি হারিয়ে রাজপুর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন রায় পরিবারের মদন রায়ের পৌত্র রাজবল্লভ রায়। তিনিই বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে এসে বসতি করেন এবং ইংরেজদের কাছ থেকে 'চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন। ফলে এই পরিবার একাধারে 'রায়-চৌধুরী' পরিবার রূপে খ্যাত হন। সেই রাজবল্লভ রায়চৌধুরীই বারুইপুরের পুরাতন বাজারে নতুন করে জমিদারি পত্তন করেন

তারপর বারুইপুরের জমিদারিতে নতুন করে তৈরী হয় ঠাকুরদালান এবং সেখানেই মহাধূমধামে সাবেক রীতিতেই পারিবারিক দুর্গাপূজা চলতে থাকে। পূর্বের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সহ রাজপুরের মতই এখানেও সেই পূজাই পুনরায় চলতে থাকে এখনও চলে আসছে। এই জমিদার বাড়ির পূজায় পূর্বে পশু বলিও

ছিল। পূজার কয়দিন প্রজাদের আমন্ত্রণ করে পেট পুরে খাওয়ানো হত। সে প্রথা এখন উঠে গেছে। পূজার শুরু হত মহালয়ার দিন থেকে চণ্ডী পাঠের মাধ্যমে। এখানে পূজার চারদিন দশ হাজার দুর্গানাম ও কৃষ্ণনাম জপিত হয়। ষষ্ঠীর দিন থেকেই শুরু হয় পশুবলি। প্রতিদিন দেবীকে চারবার করে ভোগ নিবেদন করা হত। তার মধ্যে পঞ্চ ভাজা সহ সকালে খিচুড়ি, দুপুরে অন্ন, বিকালে পরমান্ন ও সন্ধ্যায় লুচি সহ সন্দেশ ভোগ । বিদায় তিথি দশমীতে দেবীকে পান্তাভোগ নিবেদনে বিদায় দেওয়া হয়। দেবীর মাথার উপর পটচিত্রে মধ্যস্থলে অবস্থিত মহাদেবকে প্রদত্ত হয় তামাক ভোগ।

এ পূজায় আর এক বিশেষত্ব হল পূজায় তিনদিনই এক বিশাল বড় ও ভারি খাড়া দিয়ে ছাগ বলি হয়ে থাকে। এ পূজায় কিছু ব্যতিক্রমী বিশেষত্বও বর্তমান রয়েছে। যেমন - পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধার কালে অকাল বোধনে দেবী দুর্গাকে যেমন ১০৮টি নীলপদ্মে পূজা করেছিলেন এখানেও তেমনি প্রথায় ১০৮ পদ্ম দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। এখানকার সন্ধিপূজায় পরিবারের সদস্যদের দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো অনুষ্ঠান ও নবমীতে হোম যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান - দুই দেখার মত।

দ্বিতীয়ত, এই পূজা পরিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে এবং বৃহন্দিকেশ্বর পুরাণ মতে।

তৃতীয়ত, এই পূজায় সাত পুতুলের একচালা মৃন্ময়ী মূর্তি সাধারণভাবে তৈরী হয়।

এবার ঐ পূজার কিছু বৈশিষ্ট্যের কথায় আসা যাক। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির কালে, দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণের বলিদান ও অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ড প্রায় সর্বত্রই ঘড়ির নির্দেশে চালিত হলেও এখানকার পনেরো পুরুষ পূজিত প্রাচীন দুর্গাপূজায় এখনও সেই মান্ধাতার আমলের জলঘড়ি ও তামির প্রচলন ও তার দেওয়া সময় মেনেই সন্ধিক্ষণের বলিদান পরিচালিত হয়। এখানে পূজায় উল্টোরথের দিন মেড় পূজা করে শুরু হয় প্রতিমার নির্মাণ পর্ব। শুরুতে এই প্রতিমার নিমকাঠের কাঠামোটি এখনো বহাল রাখা হয়েছে।

প্রতিমার গঠনশৈলী বা আঙ্গিকেও প্রাচীন রীতিই ধরে রাখা হয়েছে। এখানের দেবী প্রতিমা একচালা সাবেক রীতিতেই তৈরী হয়। দেবীর অঙ্গ-সজ্জায় সেই

ডাকের সাজের ব্যবস্থা এখনো চলে আসছে। পূজায় বলিদান আছে। সপ্তমীর দিন একটি, অষ্টমীর দিন তিনটি এবং নবমীর দিন নয়টি ছাগ বলি হয়ে থাকে। নবমীর দিন এখানে ব্যপকভাবে 'অন্নকূটের' ব্যবস্থা হয়। আনন্দময়ী মা ও রাধাকৃষ্ণ এখানকার নিত্যসেবায় সেবিত হলেও শারদীয়া দুর্গোৎসবে চারদিন দুর্গাদালানে দেবী দুর্গা মহাধুমধামে পূজিত হন। নবমীর পূজান্তে এখানে রক্তপাতহীন চালকুমড়া বলি হয়ে থাকে।

এ পূজায় আরও বিশেষত্ব হল অষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার সময় ভোগ রান্না হয় এবং তা রাঁধেন পরিবারের কোন বয়স্ক। পূজা মণ্ডপে জ্বলে ১০৮ প্রদীপ। দশমীর দিন ঘট বিসর্জনের আগে প্রতিমার সামনে বড় গামলায় জল রাখা হয়, তাতে প্রতিমার প্রতিচ্ছবিকে সকলে প্রণাম জানায়। মেয়েরাও প্রণাম জানিয়ে সেই জলে হাত ডোবায়, কারণ পারিবারিক বিশ্বাস, ঐ জলে হাত ডোবালে মেয়েদের হাতের রান্না উপাদেয় হয় অর্থাৎ তারা রান্নায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এ পূজায় প্রতিমা বিসর্জনের আগে কনকাঞ্জলি প্রদানের রীতি আছে। তা হল এক বিশেষ ব্যবস্থা - যাতে পরিবারের সব থেকে বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুরুষ প্রতিমার পিছনে দাঁড়িয়ে, সামনে আঁচল পেতে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ির সকল সধবা মহিলাদের আঁচলে অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা সহ পাত্রস্থ চাল প্রদান করেন। এই প্রথাই 'কনকাঞ্জলি' নামে খ্যাত। এরপর চলে দেবী বরণ সেই সঙ্গে মেয়েদের সিন্দুর খেলায় মাতামাতি।

এ পূজায় বিজয়া দশমীর দিন এখনও একটা প্রথা বর্তমান রয়েছে - সেটি হল নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো। আমরা জানি ষষ্ঠীর বোধন থেকে শুরু করে দশমীর দিন ঘট বিসর্জন পর্যন্ত দেবী মর্তে থাকেন। তারপর তিনি সন্তান-সন্ততি নিয়ে শিবালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দশমীর সকালেই শিবদূত নন্দী এসে মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাগাদা দেয়। সে কারণ বহু পূজা বাড়ি থেকেই দেবী যে যাত্রা করেছেন সে বারতা শিবকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো হয়।

যাও পাখি সেথা যাও, নীলকণ্ঠের কাছে -
বলে এসো, যাবার লাগি,
মা দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে।

এবাড়ি থেকে এখনও সেই প্রাচীন রীতি মেনে নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো হয়ে থাকে।

এ বাড়ির দুর্গা পূজার আর এক উল্লেখ্য বিশেষত্ব হল - পূর্বে যারা এই পূজায় প্রতিমা তৈরী, ঢাক বাজানো, পৌরোহিত্য, প্রতিমা বিসর্জনে বাহকের ভূমিকা পালন করেছেন, নীলকণ্ঠ পাখি যোগান দিয়েছেন - সেই সকল বাড়ির লোকেরা বংশানুক্রমিক ভাবে আজও সেই কাজ করে চলেছেন। এ পূজায় আর এক স্মরণীয় বিষয় হল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৪-৬৭ খ্রিঃ সময়কালে প্রতি বছর অষ্টমীর দিন এসে মাতৃপূজায় অংশ নিয়ে দেবীপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতেন। সেদিক থেকে এ পূজা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি জড়িত পূজা। শোনা যায় এখানকার ঠাকুরদালানের গঠনশৈলী এবং জমিদার বাড়ির আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের কিছু অংশ লিখেছিলেন।

পূজা হয় নবপত্রিকায়। নবপত্রিকা স্নান করিয়ে ঘট আনার পর নবপত্রিকাকে সাজিয়ে তার সামনে ঘট স্থাপনের পর যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সহ দেবী দুর্গা পূজার মতোই নবপত্রিকারই পূজা সম্পন্ন হয়। রায়চৌধুরী পরিবারেও বলিদান আছে। তিন দিনই বলিদান সম্পন্ন হয়। এ বাড়িতেও রাধা-কৃষ্ণের সেবাও আছে কিন্তু তাদের আড়ালেই চলে বলিদান পর্ব।

রায়চৌধুরী বাড়িতে সপ্তমীর ১২ দিন আগে বোধন হয় এবং বোধন থেকে পূজা শুরু হয়ে যায়। প্রথমে বোধন ঘটের পূজার শুরু, পরে দেবীর পূজা হয়ে থাকে। চলে যথা নিয়মে এবং যথাচারে, দশমীর দিন ঘট বিসর্জনেই এ পূজার পরিসমাপ্তি ঘটে। আসলে এরা ছিলেন জমিদার, বিশেষ কোন কাজের জন্য নবাবী আমলে নবাবদের তরফ থেকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিল, ফলে তখন থেকেই এই পরিবার 'রাজা' পদবিতেই খ্যাত হয়ে আসছেন।

আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে একচালা সাবেকি ধাঁচের প্রতিমায় ঢোল ও সানাই-এর মাঙ্গলিক তানে এখানকার জমিদার বাড়িতে মা দুর্গার পূজার শুভ সূচনা হয়। তারপর সেই পূজা আজও চলে আসছে। পূর্বে এই পূজার জৌলুস ও চাকচিক্য সবিশেষ উল্লেখ্য ছিল কারণ এ পূজা ছিল রাজা উপাধির জমিদার বাড়ির পূজা। জমিদারি প্রথার বিলুপ্তির পর তার জৌলুস কমলেও নিয়ম-নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কোন ত্রুটি এখনও পর্যন্ত এ পূজায় অনুভূত হয়নি।

তবুও পূজায় বনেদিআনায় কোনো খামতি নাই। এখনও প্রতিদিন ২টি বিশাল পরাতে ২৪ সের আতপ চাল ও ২৪ সের সেদ্ধচালের নৈবেদ্য অন্যান্য উপাচারসহ পরিবেশিত হয়ে থাকে। তাছাড়াও প্রতিদিনের ভোগে বিভিন্ন আয়োজনের সঙ্গে লোভনীয় পদ হিসাবে থাকে - 'রাধাবল্লভি, মতিচুর, গজা, মুটরি, বালুসাই, পোলাও, পেরাকি, সিঙ্গাড়া, জিলিপি, খাজা, দরবেশ, পান্তুয়া, কচুরি, নিমকি এবং মিঠেগজা'। অতি অবশ্যই লুচি ও বাটা চিনি দিতেই হয়।

রাজপুর রায়চৌধুরী পরিবার

মেদন মল্ল পরগণার মধ্যেই পড়ে এই গ্রাম, বর্তমানের দক্ষিন ২৪ পরগণার বারুইপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। সোনারপুর থানার অন্তর্ভুক্ত রাজপুর গ্রামটি। পরবর্তীকালে রাজপুরের জ্ঞাতীগণের মনোভাব ও অত্যধিক বিলাসিতার জন্য রাজপুর নিলাম হয়ে গেলে রাজবল্লভ (২য়) বারুইপুরে কাছারী বাড়ীটি নতুন করে নির্মাণ করেন এবং নাম দেন রাজবল্লভ ভবন। এখানেই স্থায়ীভাবে জনপদ সৃষ্টি করে বসবাস করেন। অন্য শরিকগণ লজ্জা ও অপমানিত হয়েও দরিদ্রতার কারণে সেখানে বসবাস করছেন। পরবর্তী সময়ে অনেকেই রাজপুর ছেড়ে চলে গেছেন। রায়চৌধূরীদের পূর্বপুরুষের ভিটা আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। আজ আর কিছুই নেই সেখানে। শুধু বাড়ীর সামনে ভগ্ন আনন্দময়ী মন্দিরটি ছাড়া, সেটিও যে কোন দিনে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। বর্তমানে এই অংশের অনেকেই সরকারি চাকুরী, অধ্যাপনা, ডাক্তারি ও অন্যান্য কর্মজীবি হিসাবে, কালের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে জীবনে অনেকেই সু-প্রতিষ্ঠিত।

নতুন কালের রায়চৌধূরী বংশ

১৭৯৩ সালে রাজবল্লভ রায় বারুইপুরে চলে গেলে, পান চাষীদের গ্রাম বারুইপুর হয়ে উঠে সমৃদ্ধ মহকুমা শহর। কোর্ট বসে, সাব-রেজিস্ট্রী অফিস তৈরী হয়, আর রাজপুর হয়ে পড়ে ক্রমশ নিস্ব। বারুইপুরের রায়চৌধূরী পরিবার স্বাধীনাতার পর জমিদারি চলে গেলেও আনন্দময়ী 'মা' ও মোবারক গাজীর দয়ায় আজও রাস, রথ, চরকের মেলা করেন। দুর্গাপূজাও হয়। জমিদারি তলানিতে এসে পৌছেছে। জানিনা আর কতদিন এই ঐতিহ্য ধরে রাখা যাবে।

বর্তমান বামপন্থী জামানায় জমি থেকে হতে হয়েছে উচ্ছেদ, জমিহীন জমিদারে পরিণত হয়েছে। তাই জমির ভরসা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতা, আইন ব্যবসা, চিকিৎসক, সরকরী ও বেসরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করে নতুন কালের সাথে মানিয়ে নিয়ে চলছেন অনেকেই। অনেকে চলে গেছেন বারুইপুর ছেড়ে কোলকাতায়। যে কয়েকজন আছেন তারা পুরানো স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে ঐতিহ্যবাহী রথ, রাস, চড়ক বা দুর্গাপূজার মধ্যে দিয়ে স্মৃতি চারণ করে দিন গুনছেন। রাজবল্লভের মৃত্যুর সাথে সাথে আনন্দময়ী মা, জগন্নাথ, রাধাকান্ত নীত্যসেবা তার ছয় পুত্র দুই মাস করে দায়িত্ব পেয়েছিলেন জমিদারি ভাগের সাথে সাথে। পরবর্তী সময়ে অনেকেই দেবতাদের পালা সমেত জমিদারি অন্য শরীকদের বেচে দেন। এই হিসাবটি পাওয়া গেছে পুরোহিত রমেশ চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে। আজ আর জমিদারীর টাকায় 'আনন্দময়ী মা' বা 'রাধাকৃষ্ণ' -এর নিত্যসেবা হয় না। পালাদারদের রোজগারের টাকায় নিত্যসেবা চালু আছে, জানি না তা কত দিন থাকবে? কারণ পালাদারদের অনেকেরই বংশ আজ মেয়েদের হাতে। তারা হয়তো বাপ-ঠাকুরদার ঐতিহ্য বহন করবে কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর তাদের শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা বা পুত্র-সন্তানরা এই ঐতিহ্য আদৌ বহন করবে কি? অথচ জমিদারীর কম্পেন্‌শেসনের টাকা ঠাকুরের নামে সরকারি কোষাগারে জমা আছে। সেই টাকা তোলা যায়নি, একে অপরকে বিশ্বাস করে না বলে। সেই টাকা এখন সময় থাকতে থাকতে যদি তুলে একটি ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন করেন তবে সবটা না হলেও খানিকটা ঐতিহ্য বহন করা যাবে।

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা'র পালা

১। গৌরী শংকর দিগর	-	২২ ১ঙ্গ২ দিন-১লা বৈশাখ হইতে ২৩শে বৈশাখ দিবসের অর্দ্ধ দিন
২। নির্মল রায়চৌধুরী দিগর	-	২২ ১ঙ্গ২ দিন-২৩শে বৈশাখ দিবসের অর্দ্ধ দিন হইতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ
৩। গৌরী শংকর দিগর	-	১৫ দিন-১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৯শে জ্যৈষ্ঠ
৪। অশোকবাবু দিগর	-	১০ দিন-৩০শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ৮ই আষাঢ়
৫। অমলবাবু দিগর	-	১০ দিন-৯ই আষাঢ় হইতে ১৮ই আষাঢ়
৬। সত্যেন, সৌরেন দিগর	-	২ ১ঙ্গ২ দিন-১৯শে আষাঢ় হইতে ২১শে আষাঢ় দিবসের অর্দ্ধ দিন
৭। দীপক বাবু দিগর	-	২ ১ঙ্গ২ দিন-২১শে আষাঢ় দিবসের অর্দ্ধ দিন হইতে ২৩শে আষাঢ়
৮। সুকুমার বাবু দিগর	-	২ ১ঙ্গ২ দিন-২৪শে আষাঢ় হইতে ২৬শে আষাঢ় দিবসের অর্দ্ধ দিন
৯। অমিয়বাবু দিগর	-	২ ১ঙ্গ২ দিন-২৬শে আষাঢ় দিবসের অর্দ্ধ দিন হইতে ২৮শে আষাঢ়
১০। সরকারী	-	১ ১ঙ্গ৪ দিন-২৯শে আষাঢ় হইতে ৩০শে আষাঢ় সোয়া দিবস
১১। দেবকুমার বসু দিগর	-	৩ ৩ঙ্গ৪ দিন-৩০শে আষাঢ় দিবসের ৩ঙ্গ৪ অ ংশ হইতে ১লা শ্রাবণ
১২। সুকুমার বাবু দিগর	-	৫ দিন-২রা শ্রাবণ হইতে ৬ই শ্রাবণ
১৩। কমল বাবু দিগর	-	১ ১ঙ্গ৪ দিন-৭ই শ্রাবণ হইতে ৮ই শ্রাবণ দিবসের ১ঙ্গ৪ অংশ
১৪। সত্যেন বাবু দিগর	-	১ ১ঙ্গ৪ দিন-৮ই শ্রাবণ দিবসের ৩ঙ্গ৪ অংশ হইতে ৯ই শ্রাবণ দিবসের অর্দ্ধ দিন
১৫। নমিতা মিত্র দিগর	-	১ ১ঙ্গ৪ দিন- ৯ই শ্রাবণ দিবসের অর্দ্ধ দিন হইতে ১০ই শ্রাবণ দিবসের ৩ঙ্গ৪ অংশ
১৬। হাসিরাণী	-	১ ১ঙ্গ৪ দিন-১০ই শ্রাবণ দিবসের ১ঙ্গ৪ অংশ হইতে ১১ই শ্রাবণ
১৭। সুকুমারবাবু দিগর	-	৫ দিন-১২ই শ্রাবণ হইতে ১৬ই শ্রাবণ
১৮। গণেশবাবু	-	২ ১ঙ্গ২ দিন-১৭ই শ্রাবণ হইতে ১৯শে শ্রাবণ দিবসের অর্দ্ধ দিন
১৯। দেবকুমার বসু দিগর	-	২ ৩ঙ্গ৪ দিন-১৯শে শ্রাবণ দিবসের অর্দ্ধ দিন হইতে ২২শে শ্রাবণ সোয়া দিবস
২০। সরকারী পঃ শৈ র	-	১ দিন-২২শে শ্রাবণ দিবসের ৩ঙ্গ৪ অংশ এবং ২৩শে শ্রাবণ দিবসের ১ঙ্গ৪
২১। অশোকবাবু দিগর	-	৩ ৩ঙ্গ৪ দিন-২৩শে শ্রাবণ দিবসের ৩ঙ্গ৪ অংশ হইতে ২৬শে শ্রাবণ
২২। গাবুবাবু দিগর	-	৬ ১ঙ্গ৪ দিন-২৭শে শ্রাবণ হইতে ২রা ভাদ্র দিবসের ১ঙ্গ৪ অংশ
২৩। অশোকবাবু দিগর	-	২ ১ঙ্গ২ দিন-২রা ভাদ্র দিবসের ৩ঙ্গ৪ অংশ ৩ পোয়া হইতে ৪ঠা ভাদ্র দিনের ৩ঙ্গ৪ অংশ ৩ পোয়া
২৪। দিপকবাবু দিগর	-	১ ১ঙ্গ৪ দিন-৪ঠা ১ পোয়া এবং ৫ই ভাদ্র পর্যন্ত
২৫। গৌরী শংকর দিগর	-	১০ দিন-৬ই ভাদ্র হইতে ১৫ই ভাদ্র
২৬। অশোকবাবু দিগর	-	২ ১ঙ্গ২ দিন-১৬ই ভাদ্র হইতে ১৮ই ভাদ্র দিবসের অর্দ্ধ দিন
২৭। গাবুবাবু দিগর	-	২ ১ঙ্গ২ দিন-১৮ই ভাদ্র অর্দ্ধংশ হইতে২০শে ভাদ্র
২৮। অশোকবাবু দিগর	-	৫ দিন-২১শে ভাদ্র হইতে ২৫শে ভাদ্র
২৯। গৌরী শংকর দিগর	-	৫ দিন-২৬শে ভাদ্র হইতে ৩০শে ভাদ্র
৩০। নির্মলবাবু দিগর	-	১৫ দিন-৩১শে ভাদ্র হইতে ১৩ই আশ্বিন
৩১। গৌরী শংকর দিগর	-	১০ দিন-১৪ই আশ্বিন হইতে ২৩শে আশ্বিন অংশ এবং ২৩শে শ্রাবণ দিবসের ১ঙ্গ৪

২১। অশোকবাবু দিগর	-	৩ ৩৯৪ দিন-২৩শে শ্রাবণ দিবসের ৩৯৪ অংশ হইতে ২৬শে শ্রাবণ
২২। গাবুবাবু দিগর	-	৬ ১৯৪ দিন-২৭শে শ্রাবণ হইতে ২রা ভাদ্র দিবসের ১৯৪ অংশ
২৩। অশোকবাবু দিগর	-	২ ১৯২ দিন-২রা ভাদ্র দিবসের ৩৯৪ অংশ ৩ পোয়া হইতে ৪ঠা ভাদ্র দিনের ৩/৪ অংশ ৩ পোয়া
২৪। দিপকুবাবু দিগর	-	১ ১৯৪ দিন-৪ঠা ১ পোয়া এবং ৫ই ভাদ্র পর্যন্ত
২৫। গৌরী শংকর দিগর	-	১০ দিন-৬ই ভাদ্র হইতে ১৫ই ভাদ্র
২৬। অশোকবাবু দিগর	-	২ ১৯২ দিন-১৬ই ভাদ্র হইতে ১৮ই ভাদ্র দিবসের অর্দ্ধ দিন
২৭। গাবুবাবু দিগর	-	২ ১৯২ দিন-১৮ই ভাদ্র অর্দ্ধংশ হইতে ২০শে ভাদ্র
২৮। অশোকবাবু দিগর	-	৫ দিন-২১শে ভাদ্র হইতে ২৫শে ভাদ্র
২৯। গৌরী শংকর দিগর	-	৫ দিন-২৬শে ভাদ্র হইতে ৩০শে ভাদ্র
৩০। নির্মলবাবু দিগর	-	১৫ দিন-৩১শে ভাদ্র হইতে ১৩ই আশ্বিন
৩১। গৌরী শংকর দিগর	-	১০ দিন-১৪ই আশ্বিন হইতে ২৩শে আশ্বিন
৩২। দিপকবাবু দিগর	-	৩০ দিন-২৪শে আশ্বিন হইতে ২৩শে কার্ত্তিক
৩৩। ঘোষ বাড়ী	-	৩০ দিন-২৪শে কার্ত্তিক হইতে ২৩শে অগ্রহায়ণ
৩৪। সিধুবাবুর অংশে	-	৭ ১৯২ দিন- ২৪শে অগ্রহায়ণ হইতে ১লা পৌষ দিবসের অর্দ্ধ দিন
৩৫৷ দেবকুমার বাবু দিগর	-	২২ ১৯২ দিন-১লা পৌষ দিবসের অর্দ্ধ দিন হইতে ২২শে পৌষ
৩৬। সুকুমার বাবু দিগর	-	৪৫ দিন-২৩শে পৌষ হইতে ৯ই ফাল্গুন
৩৭। অশোক বাবু দিগর	-	৪৫ দিন-১০ই ফাল্গুন হইতে ২৪শে চৈত্র
৩৮। সরকারী		

(১)রাজকিশোর

রাজকুমার

রাজেন্দ্র গিরীন্দ্র দেবেন্দ্র ব্রজেন্দ্র

সুরেন্দ্র যতীন্দ্র রমেন্দ্র শৈলেন্দ্র দ্বিজেন্দ্র শচীন্দ

কন্যা ২ কন্যা

বিপিন্দ্র গিরীন্দ্র শশীন্দ দুর্গাচরণ বীরেন্দ নৃপেন্দ্র অসীম

কন্যা দেবকুমার কন্যা

অমরেন্দ্র (শম্ভু) গৌরীশংকর উমাশংকর

কন্যা শুভ্রা শুক্লা

নির্মলেন্দু কমলেন্দু

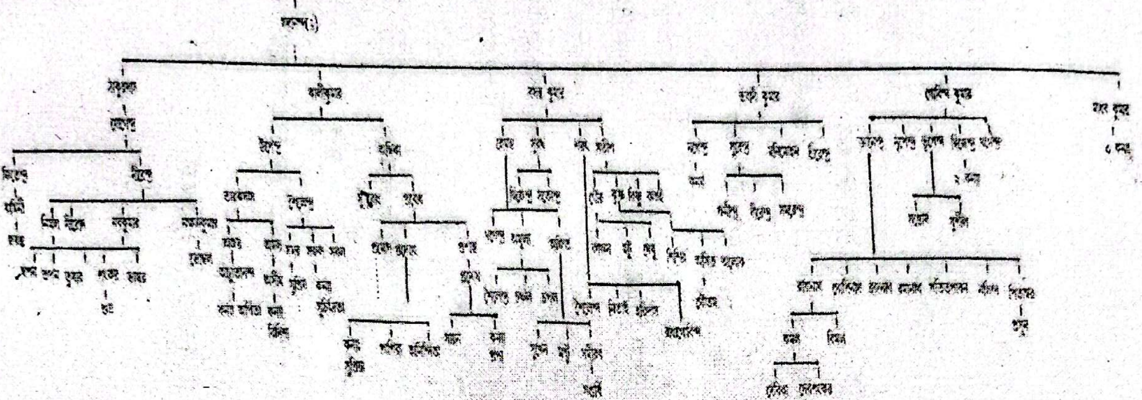
বিশ্বরূপ অমলেন্দু বিমলেন্দু কমলেন্দু

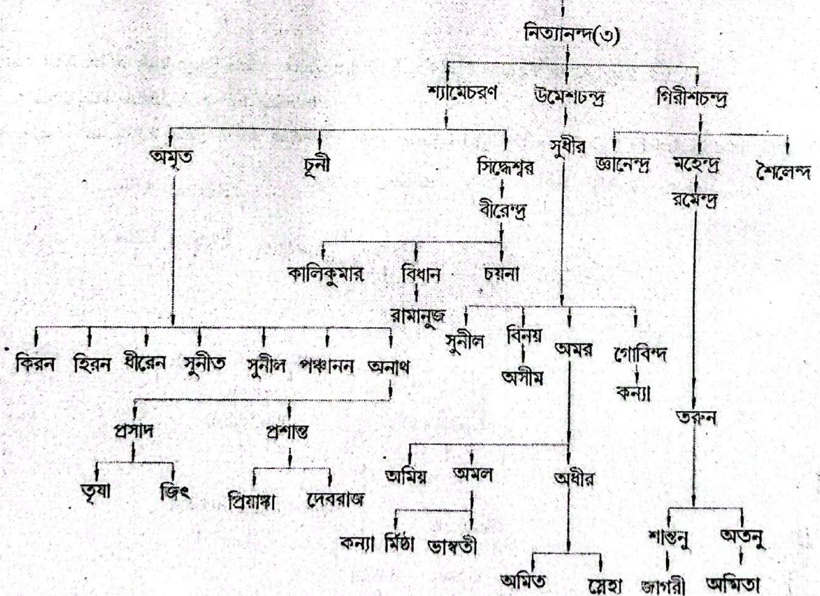
রাজর্ষী শরদিন্দু

১।রাজস্ব বাকি পড়ায় দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক কয়েদ হন এবং বাঁশড়ার (ঘুটিয়ারী শরিফ রেল ষ্টেশন) পীড়বাবা গাজীসাহেবের কৃপায় মুক্তি পান।

২।প্রায় ১ লক্ষ্য বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি দান করেন।

৩। ইহার সময় মহান্ত আনন্দগিরী কর্তৃক আনন্দময়ী দেবী বারুইপুরে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হন।





১।রাজস্ব বাকি পড়ায় দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক কয়েদ হন এবং বাঁশড়ায় (ঘুঁটিয়ারী শরিফ রেল ষ্টেশন) পীড়বাবা গাজীসাহেবের কৃপায় মুক্তি পান।

২।প্রায় ১ লক্ষ্য বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি দান করেন।

৩। ইহার সময় মহান্ত আনন্দগিরী কর্তৃক আনন্দময়ী দেবী বারুইপুরে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হন।

- পরমানন্দ
  - সূর্য কুমার
    - কালীদাস
      - জিতেন্দ্র
      - সত্যেন্দ্র
      - সুধীন্দ্র
    - শিবদাস
      - হিরেন্দ্র
        - দেবকিশোর
          - তরুন
            - শান্তনু
              - জাগরী
            - অতনু
              - অস্মিতা
          - তপন
            - অচিন
              - ধনরীতমা
              - অভিষেক
          - রঞ্জন
        - জগৎকিশোর
      - সুধাংশু
        - বিমলেন্দু
    - তারাদাস
      - সৌরেন্দ
      - শৈলেন্দ
      - শরৎ
      - প্রফুল্ল
      - প্রভাত
      - অরুন
  - যাদব কুমার
    - কন্যা

১।রাজস্ব বাকি পড়ায় দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক কয়েদ হন এবং বাঁশড়ার (ঘুঁটিয়ারী শড়িফ রেল ষ্টেশন) পীড়বাবা গাজীসাহেবের কৃপায় মুক্তি পান।

২।প্রায় ১ লক্ষ্য বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি দান করেন।

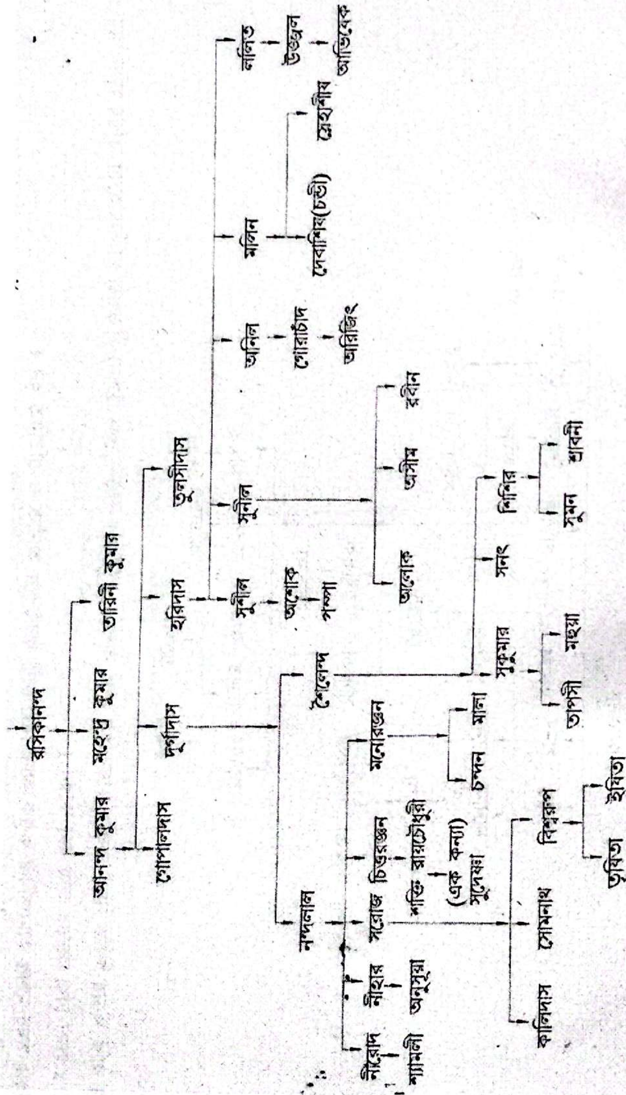
৩। ইহার সময় মহান্ত আনন্দগিরী কর্তৃক আনন্দময়ী দেবী বারুইপুরে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হন।

- কৃষ্ণানন্দ
  - ক্ষেত্রমোহন
    - ৫ কন্যা
  - কেদারনাথ
    - মন্নাথ
    - প্রমথ
      - মনোজ
      - কনোজ
      - রবীন্দ্র
    - অনাথ
    - নলিন্দ্র
      - সত্যেন্দ্র
        - সম্পা
        - সমিতা
        - পারমিতা
      - সৌরেন্দ্র
        - সঞ্চিতা
        - সৌভিক
          - সৌহাদ্য
    - পুলিন্দ্র
      - প্রদ্যোৎ
      - রঞ্জিত
        - রথীন
        - রনেন
      - কৃষ্ণলাল
      - বলরাম
        - অভিজিৎ
      - নিমাই
        - কন্যা
    - শৈলেন্দ্র
      - সমীর
    - গোপেন্দ্র
      - সমীর
      - মিহির
    - প্রবোধ
      - ৩ কন্যা

১।রাজস্ব বাকি পড়ায় দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক কয়েদ হন এবং বাঁশড়ার (ঘুঁটিয়ারী শড়িফ রেল ষ্টেশন) পীড়বাবা গাজীসাহেবের কৃপায় মুক্তি পান।

২।প্রায় ১ লক্ষ্য বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি দান করেন।

৩। ইহার সময় মহান্ত আনন্দগিরী কর্তৃক আনন্দময়ী দেবী বারুইপুরে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হন।



১।রাজস্ব বাকি পড়ায় দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক কয়েদ হন এবং বাঁশড়ার (ঘুটিয়ারী শরিফ রেল ষ্টেশন) পীড়বাবা গাজীসাহেবের কৃপায় মুক্তি পান।

২।প্রায় ১ লক্ষ্য বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি দান করেন।

৩। ইহার সময় মহান্ত আনন্দগিরী কর্তৃক আনন্দময়ী দেবী বারুইপুরে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হন।

